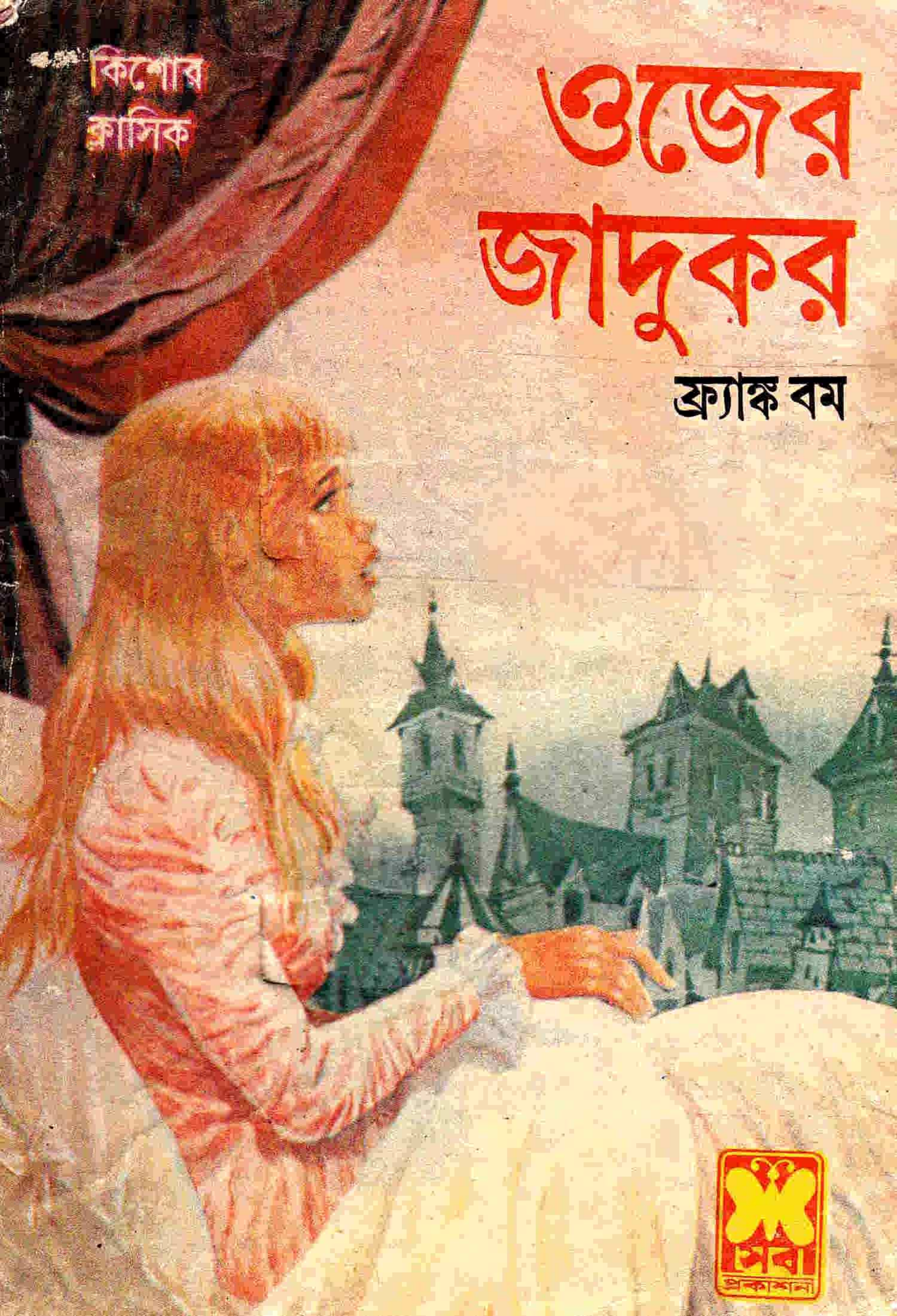
কিশোর ক্লাসিক
ওজের জাদুকর
ফ্র্যাঙ্ক বম
সেবা প্রকাশনী

ফ্র্যাঙ্ক বম

আমেরিকান লেখক ও নাট্যকার লিম্যান ফ্র্যাঙ্ক বম মূলত কিশোর-কল্পকাহিনীর রচয়িতা হিসেবেই অমর হয়ে আছেন। তাঁর জন্ম ১৮৫৬ সালের ১৫ই মে নিউ ইয়র্কের চিটেন্যাংগোয়। ১৮৮০ সালে সাউথ ডাকোটায় সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথম বই 'ফাদার গুজ' (১৮৯৯)-এর বিপুল কাটতির পর ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বই 'দি ওয়াণ্ডারফুল উইজার্ড অভ ওজ'। বইটি ১৯০২ সালে শিকাগোতে নাট্যাকারে মঞ্চস্থ হয়ে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে। এ-বইয়ের চলচ্চিত্র-রূপ (১৯৩৮) একটি অন্যতম সিনেমা ক্লাসিক হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

ওজের কাহিনী নিয়ে বম আরো তেরোটি বই রচনা করেন। স্বনামে এবং বেশ কয়েকটি ছদ্মনামে সব মিলিয়ে ষাটটির মতো বই লেখেন তিনি। তাঁর যুগে সেসব বইয়ের প্রতিটিই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১৯১৯ সালের ৬ই মে ক্যালিফর্নিয়ার হলিউডে ফ্র্যাঙ্ক বমের জীবনাবসান হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

এক

দিগন্তজোড়া ক্যানসাস তৃণভূমির মাঝখানে বাস করে ছোট্ট মেয়ে ডরোথি। মা-বাবা নেই তার, থাকে হেনরি কাকা আর এম কাকীর সঙ্গে। হেনরি কাকা চাষবাস করে।

যে-বাড়িতে থাকে তারা, সেটা তৈরির জন্যে অনেক দূর থেকে ওয়্যাগনে করে কাঠ বয়ে আনতে হয়েছিল। বাড়িটা তাই আকারে খুব ছোট। চার দেয়াল, মেঝে, ছাদ—এই নিয়ে একটামাত্র কামরা। কামরায় আছে মরচে-পড়া একটা রান্নার উনুন, বাসনকোসন রাখার আলমারি, একটা টেবিল, তিন-চারখানা চেয়ার, আর দু'টো বিছানা। এককোণে হেনরি কাকা আর এম কাকী ঘুমোয় একটা বড়ো বিছানায়, আরেক কোণে ছোট একটা বিছানায় ঘুমোয় ডরোথি।

বাড়ির ওপরতলা বলে কিছু নেই, তলকুঠুরিও নেই। ঘূর্ণিবায়ুর সময় আশ্রয় নেয়ার জন্যে মেঝের নিচে ছোট একটা গর্ত আছে শুধু। সেটাকেই ওরা তলকুঠুরি বলে। মেঝের ঠিক মাঝখানের একটা চৌকো চোরাদরজা গ'লে মই বেয়ে সেই অপরিসর অন্ধকার গর্তে নামতে হয়। তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ওঠে। সর্বনাশা সেই ঝড়ের কবলে পড়লে যে-কোনো ঘরবাড়ি মুহূর্তে ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডরোথি যেদিকেই তাকায়, বিশাল ধূসর তৃণ-প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কোথাও একটা গাছ কিংবা বাড়ি পর্যন্ত নেই; শুধু বিস্তৃত খোলা সমতলভূমি চারদিকে বিছিয়ে রয়েছে আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত। সূর্যের খরতাপে চষা জমি শুকিয়ে ধূসর হয়ে গেছে, সরু সরু ফাটল এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে তার ভেতর দিয়ে। মাঠের ঘাস পর্যন্ত সবুজ নয়, প্রখর রোদে পুড়ে লম্বা ডগাগুলো চারপাশের আর সবকিছুর মতোই ধূসর হয়ে উঠেছে। ডরোথিদের বাড়িতে একবার রঙ করা হয়েছিল, কিন্তু রোদের তাপে চটে গেছে সে-রঙ, তারপর ধুয়ে গেছে বৃষ্টির জলে। এখন বাড়িটার চেহারাও আর সব জিনিসের মতোই বিবর্ণ, ধূসর।

এম কাকী যখন প্রথম এখানে আসে, তখন সে ছিলো উচ্ছল সুন্দরী তরুণী। তৃণভূমির নির্মম রোদ আর হাওয়া তাকেও অনেক বদলে দিয়েছে। চোখে আর আগের সেই উজ্জ্বলতা নেই, সে-চোখে নেমে এসেছে ম্লান ধূসর ছায়া। গাল আর ঠোঁটের লালিমা মুছে গেছে, পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে মুখখানা। শীর্ণ নিষ্প্রাণ এম কাকী এখন ভুলেও হাসে না।

মা-বাবাকে হারিয়ে ডরোথি প্রথম যখন এখানে এসে ওঠে, তার হাসির শব্দে এম কাকী ভয়ানক চমকে উঠতো। ডরোথির উৎফুল্ল স্বর কানে যাওয়ামাত্র আর্তনাদ করে উঠে হাত চাপা দিতো বুকে। এখনও ছোট্ট ডরোথির দিকে চেয়ে এম কাকী অবাক হয়ে ভাবে, এখানে কী দেখে অমন করে হাসতে পারে মেয়েটা।

হেনরি কাকাও কখনো হাসে না। উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, হাসি আনন্দ কাকে বলে তা তার জানা নেই। তারও চেহারা ধূসর, লম্বা দাড়ি থেকে শুরু করে ছেঁড়াখোঁড়া জুতো পর্যন্ত সবই

বিবর্ণ মলিন। কঠোর এবং গম্ভীর মনে হয় হেনরি কাকাকে। কথা-বার্তা বলেই না প্রায়।

ডরোথি হাসতে পারে টোটোর জন্যে। টোটোর কারণেই সে চারপাশের অন্য সবকিছুর মতো রুক্ষ নির্জীব হয়ে যায়নি। টোটো আসলে ছোট্ট একটা কালো কুকুর। ভারী তরতাজা। গায়ে বড়ো বড়ো মসৃণ লোম। একরত্তি নাকটা দেখলে হাসি পায়, সেটার দু'পাশে দু'টো খুদে কালো চোখ সবসময় ফুর্তিতে চক্‌চক্‌ করে। সারাদিন খেলে বেড়ায় টোটো, ডরোথিও তার সঙ্গে খেলা করে, তাকে খুব ভালোবাসে।

আজ অবশ্য ওরা খেলছে না। হেনরি কাকা দোরগোড়ায় বসে উদ্বিগ্নমুখে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। আকাশ আজ অন্যদিনের চেয়েও বেশি ধূসর দেখাচ্ছে। টোটোকে কোলে নিয়ে ডরোথিও দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এম কাকী থালা-বাসন ধোয়ার কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ বহুদূর উত্তর থেকে বাতাসের চাপা আর্তনাদ ভেসে এলো। সামনে তাকিয়ে হেনরি কাকা এবং ডরোথি দেখতে পেলো, বাতাসের দাপটে লম্বা ঘাস নুয়ে পড়ছে, ঘাসের বনে মস্ত ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে ঝড়। এমন সময় দক্ষিণ থেকেও ভেসে এলো তীক্ষ্ণ একটা জোরালো শিসের মতো আওয়াজ। চমকে ফিরে তাকিয়ে ওরা দেখলো, সেদিক থেকেও তৃণভূমির বুকে আলোড়ন তুলে ধেয়ে আসছে ঝড়।

দ্রুত উঠে দাঁড়ালো হেনরি কাকা।

'ঝড় আসছে, এম!' চেঁচিয়ে বললো এম কাকীর উদ্দেশে, 'গরু-বাছুরগুলো দেখতে যাচ্ছি আমি।' গরু আর ঘোড়াগুলো যে-চালা-

www.boiRboi.blogspot.com

ঘরে থাকে, একছুটে চলে গেল সেদিকে।

কাজ ফেলে এম কাকী দরজার কাছে ছুটে এলো। একপলক তাকিয়েই বুঝে নিলো, বিপদ এসে পড়েছে প্রায়।

'জলদি, ডরোথি!' চিৎকার করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, 'তলকুঠুরিতে চলো!'

টোটো লাফ দিয়ে ডরোথির কোল থেকে নেমে পড়ে একদৌড়ে বিছানার তলায় গিয়ে লুকোলো। সঙ্গে সঙ্গে ডরোথি ধরতে ছুটলো তাকে।

এম কাকী ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে। ঘরের মাঝখানে এসে মেঝের চোরাদরজা খুলে ফেললো এক ঝটকায়। তারপর মই বেয়ে ত্রস্তপায়ে ছোট্ট অন্ধকার গর্তের ভেতর নেমে গেল।

এদিকে ডরোথি অনেক কষ্টে টোটোর নাগাল পেল শেষ পর্যন্ত। তাকে ধরে কোলে তুলে নিয়ে তলকুঠুরির দরজার দিকে ছুটলো। ঘরের অর্ধেকটা মাত্র পেরিয়েছে, এমন সময় ভয়ঙ্কর জোরালো একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠলো বাতাসে। সেইসঙ্গে এতো জোরে কেঁপে উঠলো বাড়ি যে পা হড়কে গেল ডরোথির। ধপ্ করে বসে পড়লো মেঝের ওপর।

ঠিক তখুনি অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটলো।

গোটা বাড়ি ঘুরপাক খেলো দু তিনবার, তারপর বাতাসে ভর করে ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যেতে শুরু করলো। ডরোথির মনে হলো, ঠিক যেন একটা বেলুনে চড়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে।

ডরোথিদের বাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো ঠিক সেখানে এসে এক হয়েছে উত্তর আর দক্ষিণের ঝোড়ো হাওয়া। ফলে ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে জায়গাটা। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে বাতাস

www.boiRboi.blogspot.com

সাধারণত স্থির থাকে, কিন্তু চারপাশের বাতাস ক্রমাগত প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে সেখানে। এই চাপের ফলেই ডরোথিকে নিয়ে ঘরটা ধীরে ধীরে ওপরে, আরো ওপরে উঠে যেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিবায়ুর একেবারে শিখরে গিয়ে পৌঁছুলো সেটা। তারপর বাতাসের ঘূর্ণির পিঠে সওয়ার হয়ে হালকা পালকের মতো ভেসে চললো মাইলের পর মাইল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারপাশে বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন। কিন্তু ডরোথি বুঝতে পারছে, বেশ সহজ সাবলীলভাবে ভেসে চলেছে ওদের ঘর। প্রথমে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়েছিল ঘরটা, এরপর শূন্যে উঠে এসে একবার বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু তারপর আর কোনো অসুবিধে হয়নি। ডরোথির মনে হচ্ছে, কেউ যেন দোল দিচ্ছে তাকে আস্তে আস্তে—দোলনায় শোয়ানো বাচ্চাকে যেভাবে দোল দেয়া হয়।

টোটোর অবশ্য মোটেই পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা। ঘরময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে সে, ঘেউঘেউ করে ডাকছে জোরে জোরে; একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে যাচ্ছে। কিন্তু ডরোথি চুপচাপ বসে রয়েছে মেঝের ওপর। ভাবছে, দেখা যাক কী হয়।

ছুটোছুটি করতে করতে একবার খোলা চোরাদরজার খুব কাছে চলে গেল টোটো। অমনি ফোকর গ'লে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। আঁতকে উঠলো ডরোথি। কিন্তু পরমুহূর্তে দেখতে পেলো, টোটোর একটা কান বেরিয়ে আছে ফোকরের কিনার ঘেঁষে। বাতাসের প্রবল চাপ ওপর দিকে ঠেলে রেখেছে তাকে, ফলে নিচে পড়ে যেতে পারছে না। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল ডরোথি। টোটোর কানটা মুঠি করে ধরে আবার টেনে তুললো তাকে ঘরের ভেতর। চোরা-

দরজাটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিলো যাতে আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ধীরে ধীরে ভয় কাটিয়ে উঠলো ডরোথি। কিন্তু খুব একা লাগছে তার। ঘরের চারপাশে বিক্ষুব্ধ বাতাসের অবিশ্রান্ত গর্জন। কানে তালা লেগে গিয়েছে প্রায়। প্রথমদিকে ডরোথির মনে হয়েছিল, বাড়িটা আবার মাটিতে পড়ামাত্র তার হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন ভয়ঙ্কর কোনকিছু ঘটলো না, মন থেকে আস্তে আস্তে উদ্বেগ দূর হয়ে গেল তার। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে কী ঘটে দেখবার জন্যে শান্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো।

আরো অনেকক্ষণ কেটে গেল। একসময় দোলায়মান মেঝের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লো ডরোথি। টোটোও পিছু পিছু এসে তার পাশে শুয়ে পড়লো।

ঘরের দুলুনি আর বাতাসের একটানা গর্জন সত্ত্বেও ডরোথির চোখের পাতা ধীরে ধীরে ভারী হয়ে এলো। অচিরেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো সে।

www.boiRboi.blogspot.com

দুই

আচমকা এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল ডরোথির। ভাগ্যিস নরম বিছানায় শুয়ে ছিলো, নইলে হয়তো ছিটকে পড়ে মারাত্মক জখম হতো। আঁতকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে ভাবতে লাগলো সে, কী ব্যাপার! টোটো তার মুখে খুদে ঠাণ্ডা নাক গুঁজে কুঁইকুঁই করছে অসহায়ভাবে।

উঠে বসলো ডরোথি। লক্ষ্য করলো, ঘর স্থির হয়ে গেছে পুরোপুরি। আঁধারও মিলিয়ে গেছে—জানালা দিয়ে উজ্জ্বল রোদ এসে ছোট্ট ঘরখানা ভরিয়ে দিয়েছে আলোয়। একলাফে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটলো। টোটো পিছু নিলো তার।

দরজা খুলতেই বিস্ময়ে অস্ফুট আওয়াজ করে উঠলো ডরোথি। চারপাশে তাকিয়ে তার দু'চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো। কী অদ্ভুত অপূর্ব দৃশ্য!

ঘূর্ণিবায়ু বাড়িটাকে বয়ে এনে বলতে গেলে খুব আস্তে করেই নামিয়ে দিয়েছে এক অপরূপ সুন্দর দেশে। চারদিকে মনোরম সবুজের সমারোহ। সুঠাম চেহারার বড়ো বড়ো গাছে পরিপক্ব রসালো ফল ঝুলছে। এখানে-ওখানে বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য ফুলের মেলা। গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ে অপূর্ব সুন্দর পাখিরা ঝাঁক

বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে, গান গাইছে। একটু দূরে ছোট একটা নদী চঞ্চল ছন্দে ঝিক্‌মিক্ করে বয়ে চলেছে সবুজে-ছাওয়া দু'তীরের মাঝখান দিয়ে। রুক্ষ ঊষর তৃণভূমির মেয়ে ডরোথির কানে নদীর কুলকুল শব্দ মধুর সঙ্গীতের মতো মনে হলো।

আশ্চর্য মনোরম এই দৃশ্যের দিকে মুগ্ধ বিস্মিত চোখে চেয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে ছিলো ডরোথি। এমন সময় লক্ষ্য করলো, অদ্ভুতদর্শন একদল মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। এ-পর্যন্ত সে যতো বয়স্ক লোকজন দেখেছে, আকারে তাদের কারো সমান বড়ো নয় এরা; আবার একেবারে ছোটও নয়। ডরোথির মনে হলো, আসলে লম্বায় প্রায় ওরই মতো হবে লোকগুলো। বয়সের তুলনায় ডরোথি মোটেই ছোট নয় দেখতে, অথচ ওই লোকগুলোকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বয়সে ওরা তার চেয়ে অনেক বড়ো।

দলে সবসুদ্ধ চারজন মানুষ। তিনজন পুরুষ, একজন মেয়ে। কিম্ভূত পোশাক সবার পরনে। মাথায় গোল টুপি, সেগুলোর ওপর-দিকটা ক্রমে সরু হতে হতে মাথা থেকে প্রায় একফুট ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে। টুপির কিনারা বরাবর ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলানো। লোকগুলো হাঁটছে, আর ঘণ্টা বাজছে মিষ্টি মৃদু টুংটাং শব্দে। পুরুষ-লোকগুলোর টুপির রঙ নীল, কিন্তু মহিলার টুপি শাদা রঙের। তার পরনে শাদা গাউন, সরু সরু ভাঁজে সুন্দর ভঙ্গিতে নেমে এসেছে কাঁধ থেকে। সেটার ওপর বসানো ছোট ছোট তারা উজ্জ্বল রোদে হীরের মতো ঝক্‌মক্ করছে। পুরুষলোকগুলোর পোশাক তাদের টুপির মতো একই রকমের নীল। পায়ে পালিশ করা চক্‌চকে জুতো, জুতোর পাকানো ডগা ঘন নীল রঙের। ডরোথির মনে হলো, পুরুষলোকগুলো বয়সে প্রায় হেনরি কাকার সমান হবে, কারণ তিন-

www.boiRboi.blogspot.com

জনের মধ্যে দু'জনের রীতিমতো দাড়ি আছে। তবে খুদে মহিলার বয়স নিঃসন্দেহে আরো অনেক বেশি। তার সারা মুখ অজস্র ভাঁজে ভর্তি, চুল প্রায় শাদা, হাঁটছে কিছুটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

ডরোথি তেমনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের সামনে এসে আজব লোকগুলো থেমে পড়লো। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা ফিস্‌ফিস্ করে, যেন কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে। সবার আগে খুদে বুড়ি এগিয়ে এলো সামনে। ডরোথির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেকখানি মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলো। তারপর মিষ্টি স্বরে বলে উঠলো:

'স্বাগতম্, হে পরম মহানুভব জাদুকরী! মাঞ্চকিনদের দেশে স্বাগতম্। পূর্বরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীকে হত্যা করে তার দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে এ-রাজ্যের লোকদের মুক্তি দিয়েছো বলে আমরা তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'

কথাগুলো শুনে ডরোথি হতবাক হয়ে গেল। মানে কী এসবের? আজব এই বুড়ি কেন তাকে জাদুকরী বলছে? কেন বলছে, পূর্ব রাজ্যের ডাইনীকে হত্যা করেছে ও? নিতান্ত নিরীহ এবং শান্তশিষ্ট একটা ছোট্ট মেয়ে ছাড়া তো আর কিছু নয় ও। ঘূর্ণিবায়ু ওকে বয়ে নিয়ে এসেছে নিজের দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে। ডাইনী তো দূরের কথা, জীবনে সে কোনকিছুই মারেনি।

কিন্তু উত্তর শোনার জন্যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে বুড়ি। কাজেই একটু ইতস্তত করে ডরোথি বললো, 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় কোথাও ভুল করছো। আমি কাউকে মারিনি।'

'তোমার ঘরের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে,' হেসে বললো বুড়ি, 'ওই একই কথা হলো। ওই দেখো!' আঙুল দিয়ে ঘরের একটা

কোণ দেখালো সে, 'ডাইনীর দু'টো পা বেরিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছো ?'

মুখ ফিরিয়ে সেদিকে তাকালো ডরোথি। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো ভয়ে। যে প্রকাণ্ড আড়কাঠের ওপর ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে সেটার একমাথার নিচ থেকে সত্যি বেরিয়ে আছে দু'টো পায়ের পাতা। দু'পায়ে দু'পাটি রুপোর জুতো। সেগুলোর ডগা ছুঁচলো।

'হায় হায়, এ কী হলো!' দু'হাত এক করে মুঠি পাকিয়ে অস্থির স্বরে বিলাপ করে উঠলো ডরোথি। 'ঘরটা এসে ওর গায়ের ওপর পড়েছে নিশ্চয়। এখন কী করি আমরা ?'

'কিছুই করার নেই,' শান্ত স্বরে বললো বুড়ি।

'কিন্তু কে ও ?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'পুবরাজ্যের দুষ্ট ডাইনী, আগেই বলেছি তোমাকে,' বুড়ি জবাব দিলো। 'বহু বছর ধরে সে মাঞ্চ্‌কিনদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, দিনরাত দাসদাসীর মতো খাটিয়ে মারতো। এতদিনে মুক্তি পেলো তারা। এই উপকারের জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ সবাই।'

'মাঞ্চ্‌কিনরা কারা ?' জিজ্ঞেস করলো ডরোথি।

'এই পুবরাজ্যের বাসিন্দা যারা, তারাই মাঞ্চ্‌কিন। এখানেই দুষ্ট ডাইনী রাজত্ব করতো।'

'তুমিও কি মাঞ্চ্‌কিন ?' আবার প্রশ্ন করলো ডরোথি।

'না, আমার বাস উত্তররাজ্যে। তবে মাঞ্চ্‌কিনদের বন্ধু আমি। পুবের ডাইনী মারা গেছে দেখে ওরা আমাকে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়েছিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। আমি উত্তরের মায়াবিনী। ডাইনীও বলতে পারো।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বলো কী!' ডরোথি চোখ কপালে তুললো, 'সত্যিকার ডাইনী তুমি ?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' বুড়ি জবাব দিলো। 'তবে আমি ভালো ডাইনী, লোকে আমাকে ভালোবাসে। যে দুষ্ট ডাইনী এখানে রাজত্ব করতো, তার ক্ষমতা বেশি ছিলো আমার চেয়ে; নয়তো এখানকার বাসিন্দাদের আমিই মুক্ত করতে পারতাম।'

'কিন্তু আমি ভাবতাম, সব ডাইনীই খারাপ,' ডরোথি বললো। সত্যিকার এক ডাইনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সে, ভেবে বেশ ভয়-ভয় লাগছে।

'না না, মোটেই না—কথাটা একেবারেই ভুল। ওজের দেশে সব মিলিয়ে চারজন ডাইনী ছিলো। তাদের মধ্যে উত্তরে আর দক্ষিণে বাস যে-দু'জনের, তারা ভালো ডাইনী। কোনো সন্দেহ নেই এতে, কারণ আমি নিজেই ওই দু'জনের একজন—আমার ভুল হতে পারে না। পুব আর পশ্চিমের দুই ডাইনী সত্যি খারাপ। তবে তুমি দু'জনের একজনকে মেরে ফেলায় এখন ওজের দেশে খারাপ ডাইনী রইলো শুধু একজন—পশ্চিমরাজ্যের ডাইনী।'

'কিন্তু,' এক মুহূর্ত ভেবে ডরোথি বললো, 'এম কাকী যে আমাকে বলেছে, অনেক অনেক বছর আগেই সব ডাইনী মরে শেষ হয়ে গেছে ?'

'এম কাকী কে ?' খুদে বুড়ি জানতে চাইলো।

'আমার কাকী, ক্যানসাসে থাকে—সেখান থেকেই তো আমি এসেছি।'

উত্তরের মায়াবিনী মাথা নুইয়ে মাটির ওপর চোখ রেখে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো। তারপর মুখ তুলে বললো, 'ক্যানসাস জায়গাটা

কোথায় আমি জানি না, আগে কখনো নামও শুনিনি। আচ্ছা, একটা কথা বলো দেখি, ওটা কি সভ্য মানুষের দেশ ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' ডরোথি উত্তর দিলো।

'এবার তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। সভ্য দেশে বোধ হয় কোনো ডাইনী অবশিষ্ট নেই আর। কোনো মায়াবিনী, কুহকিনী, জাদুকরী কিছুই নেই। কিন্তু ওজের দেশ তো আজ পর্যন্ত সভ্য হয়নি, কারণ সারা দুনিয়ার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ নেই আমাদের। সেজন্যেই আমাদের মধ্যে এখনও ডাইনী আছে, জাদুকর আছে।'

'জাদুকর কারা ?' ডরোথি প্রশ্ন করলো।

'ওজ নিজেই একজন মস্ত জাদুকর,' প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিলো মায়াবিনী। 'আমাদের সবার যা ক্ষমতা, তাঁর একার ক্ষমতা তারও চেয়ে ঢের বেশি। তিনি থাকেন পান্নানগরীতে।'

আরো একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো ডরোথি, কিন্তু ঠিক সে-সময় একটু দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা মাঞ্চ্‌কিনেরা হঠাৎ একসঙ্গে জোরে চিৎকার করে উঠলো। ঘরের কোণে যেখানে দুষ্ট ডাইনী চাপা পড়েছে, সেদিকে কী যেন দেখাতে চাইছে তারা আঙুল তুলে।

'কী হয়েছে ?' বলতে বলতে ফিরে তাকালো উত্তররাজ্যের মায়াবিনী, তারপর হাসতে শুরু করলো। মৃত ডাইনীর পা-দু'টো পুরোপুরি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। পড়ে রয়েছে শুধু রুপোর জুতোজোড়া।

'অনেক বয়েস হয়েছিল ওর,' উত্তরের ডাইনী ব্যাখ্যা করলো, 'সেজন্যে দেখতে দেখতে রোদের তাপে শুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর কোনো অস্তিত্ব রইলো না পুবের ডাইনীর। রুপোর জুতোজোড়া এখন তোমার, তুমিই পরবে ওগুলো।' ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

গিয়ে জুতোজোড়া কুড়িয়ে নিয়ে এলো সে। ঝাঁকুনি দিয়ে ভেতর থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে সেগুলো ডরোথির হাতে তুলে দিলো।

'পুবের ডাইনীর খুব গর্ব ছিলো ওই জুতোজোড়া নিয়ে,' মাঞ্চ্‌কিনদের একজন বলে উঠলো, 'কী যেন একটা জাদুর ক্ষমতা আছে ওগুলোর। কী সেই ক্ষমতা, আমরা কোনদিন জানতে পারিনি।'

জুতোজোড়া নিয়ে ডরোথি ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর রেখে দিলো। তারপর আবার মাঞ্চ্‌কিনদের কাছে ফিরে এসে বললো :

'আমি আমার কাকা-কাকীর কাছে ফিরে যেতে চাই, আমার জন্যে নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তায় আছে তারা। কীভাবে কোন্ পথে যাবো, তোমরা বলে দিতে পারো ?'

মায়াবিনী আর মাঞ্চ্‌কিনেরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে তাকালো ডরোথির দিকে। এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো।

'পুবে এক বিশাল মরুভূমি আছে,' বললো একজন, 'এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আজ পর্যন্ত কেউ প্রাণে বেঁচে সেই মরুভূমি পাড়ি দিতে পারেনি।'

'দক্ষিণেও তা-ই,' আরেকজন বললো। 'আমি গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছি। কোয়াডলিংদের বসতি দক্ষিণের রাজ্যে।'

'আমি শুনেছি,' তৃতীয় মাঞ্চ্‌কিন বললো, 'পশ্চিমেও আছে এক ভয়াল মরুভূমি। পশ্চিমের রাজ্যে থাকে উইঙ্কিরা। পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনী সে-রাজ্য শাসন করে। ও-পথে কেউ যেতে চেষ্টা করলে ডাইনী তাকে দাস বানিয়ে রাখে।'

'আমার বাড়ি উত্তরে,' মায়াবিনী বুড়ি বললো। 'উত্তররাজ্যের কিনার ঘেঁষেও রয়েছে এই ওজের দেশ ঘিরে থাকা একই বিশাল

মরুভূমি। আমার মনে হয়, তোমাকে এ-দেশেই থেকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। তাছাড়া তো কোনো উপায় দেখছি না।'

ডরোথির দু'চোখ ছলছল করে উঠলো। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো সে। এই অজানা দেশে অপরিচিত আজব লোকজনের মধ্যে ভারী একা লাগছে তার।

ডরোথিকে কাঁদতে দেখে কোমলহৃদয় মাঞ্চ্‌কিনদেরও খুব দুঃখ হলো বোধ হয়। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে রুমাল বের করে তারাও কাঁদতে শুরু করলো।

মায়াবিনী বুড়ি এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো এবার। মাথা থেকে টুপি খুলে সেটার সরু চূড়া নিজের নাকের ডগার ওপর রেখে টুপিটা দাঁড় করালো সে। তারপর গম্ভীর গলায় গুনলো, 'এক, দুই, তিন!'

অমনি একখানা স্লেটে পরিণত হয়ে গেল টুপিটা, তার ওপর চক দিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা :

ডরোথি পান্নানগরীতে চলে যাক

নাকের ওপর থেকে স্লেটখানা নামালো বুড়ি। লেখাটা পড়লো। 'তোমার নাম ডরোথি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ,' মুখ তুলে তাকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিলো ডরোথি।

'তাহলে পান্নানগরীতে যেতে হবে তোমাকে। হয়তো ওজ তোমাকে সাহায্য করবেন।'

'পান্নানগরী কোথায়?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'এ-দেশের ঠিক মাঝখানে। সেখানে শাসন করেন ওজ, সেই

www.boiRboi.blogspot.com

বিরাট জাদুকর, যাঁর কথা বললাম তোমাকে।'

'ওজ কি ভালো মানুষ?' ডরোথি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানতে চাইলো।

'ভালো জাদুকর। মানুষ কিনা বলতে পারি না। আমি কখনো দেখিনি তাঁকে।'

'যাবো কী করে সেখানে?'

'হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অনেক লম্বা পথ। সে-পথ কোথাও নিরাপদ, কোথাও ভয়াবহ। তবে তোমার যাতে কোনো বিপদ না হয় সেজন্যে আমি আমার জাদুর ক্ষমতা দিয়ে যতদূর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।'

'আমার সঙ্গে যাবে না তুমি?' মিনতি করলো ডরোথি। খুদে মায়াবিনীকেই সে একমাত্র বন্ধু বলে ধরে নিয়েছে ইতোমধ্যে।

'না, যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' বললো বুড়ি, 'তবে আমি তোমাকে একটা চুমু দিয়ে দেবো—উত্তরের ডাইনী যাকে চুমু দিয়েছে তার অনিষ্ট করার সাহস কারো হবে না।'

ডরোথির কাছে এগিয়ে এলো সে, তারপর আলতো করে চুমু খেলো তার কপালে। ঠোঁটের ছোঁয়া লাগলো যেখানে, সেখানে গোলাকার একটা ঝক্‌ঝকে ছাপ ফুটে রইলো।

'পান্নানগরীতে যাবার রাস্তায় হলুদ-রঙা ইট বিছানো রয়েছে,' বললো ডাইনী, 'কাজেই তোমার পথ হারাবার ভয় নেই। ওজের কাছে যখন পৌঁছুবে, তাঁকে ভয় পেয়ো না। তোমার সব কথা খুলে বলে তাঁর সাহায্য চাইবে। এবার চলি তাহলে—বিদায়!'

তিন মাঞ্চ্‌কিন মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো ডরোথিকে, তার শুভযাত্রা কামনা করে ঘুরে দাঁড়ালো। গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা ধীরে ধীরে।

ডাইনী ডরোথির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দ্রুত পাক খেলো তিনবার। অমনি একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে।

খুদে টোটো সাংঘাতিক আশ্চর্য হয়ে এবার জোরে জোরে ঘেউ-ঘেউ করে উঠলো। ডাইনী যতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো ততক্ষণ সে ভয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

তবে ডরোথি একটুও অবাক হয়নি। বুড়ি যখন আসলে ডাইনী, তখন সে যে ঠিক অমনি করেই অদৃশ্য হয়ে যাবে তা ও আগেই ধরে নিয়েছিল মনে মনে।

www.boiRboi.blogspot.com

তিন

সবাই চলে গেছে। আবার একা হয়ে পড়েছে ডরোথি। এতক্ষণে মনে হলো তার, বেশ খিদে পেয়েছে।

আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। একটুকরো রুটি কেটে নিয়ে তাতে মাখন লাগালো। টোটোকে খেতে দিলো খানিকটা। তারপর তাক থেকে একটা বালতি নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছোট নদীটার তীরে চলে গেল। স্বচ্ছ ঝকঝকে জল ভরে নিলো বালতিতে।

এরই মধ্যে টোটো এক দৌড়ে গাছপালার ভেতর চলে গেছে। ডালে বসা পাখিদের দিকে তাকিয়ে ঘেউঘেউ করছে। তাকে ধরে আনতে গিয়ে ডরোথির চোখে পড়লো, ডালে ডালে চমৎকার রসালো ফল ঝুলছে। নাশতার জন্যে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে! কিছু ফল পেড়ে নিলো সে হাত বাড়িয়ে।

ঘরে ফিরে এসে নাশতা সারলো টোটোকে সঙ্গে নিয়ে। বালতি থেকে নদীর শীতল স্বচ্ছ জল পান করে তৃষ্ণা মেটালো। তারপর পান্নানগরীর পথে যাত্রা করার জন্যে তৈরি হতে শুরু করলো।

পরনেরটা ছাড়া আর একটামাত্র পোশাক আছে ডরোথির। ভাগ্য ভালো, পরিষ্কারই রয়েছে সেটা। তার বিছানার পাশে একটা পেরেকের সঙ্গে যেমন ঝোলানো ছিলো, তেমনি আছে এখনও।

শাদা আর নীল চৌখুপি-আঁকা কাপড়ের তৈরী পোশাকটা। বহুবার ধোয়ার ফলে নীল রঙ কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে, তবু ফ্রকটা এখনও বেশ সুন্দর রয়েছে দেখতে।

ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে ডরোথি পরিচ্ছন্ন ফ্রক পরে নিলো। রোদ এড়াবার জন্যে গোলাপী সানবনেট বাঁধলো মাথায়। আলমারি থেকে রুটি বের করে ছোট একটা ঝুড়িতে ভরে নিলো। তারপর শাদা একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দিলো ঝুড়ির ওপর। নিজের পায়ের দিকে তাকালো সে। একেবারে পুরনো আর ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে পড়েছে তার জুতোজোড়া।

'এই জুতো নিয়ে এতো পথ কিছুতেই যাওয়া যাবে না, তাই না রে টোটো?' বললো সে।

খুদে কালো চোখ তুলে টোটো তার মুখের দিকে চাইলো। লেজ নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করলো, ডরোথির কথা সে বেশ বুঝতে পারছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডরোথির চোখ পড়লো টেবিলের ওপর রাখা পুর্বরাজ্যের নিহত ডাইনীর রুপোর জুতোজোড়ার ওপর।

'আমার পায়ে ও-জুতো লাগবে কিনা কে জানে!' টোটোর উদ্দেশে বললো সে। 'তবে ওরকম জুতোই দরকার লম্বা পথ পাড়ি দিতে হলে; সহজে ক্ষয় হবে না।'

পুরনো চামড়ার জুতো খুলে ফেলে রুপোর জুতোয় পা ঢুকিয়ে ডরোথি দেখলো, বেশ সুন্দরভাবে তার পায়ে লেগে যাচ্ছে জুতো-জোড়া। যেন ঠিক তারই পায়ের মাপে তৈরি হয়েছে।

প্রস্তুতি শেষ। এবার ঝুড়িটা হাতে তুলে নিলো ডরোথি।

'চল্, টোটো,' বললো সে, 'পান্নানগরীতে গিয়ে জাদুকর ওজকে

www.boiRboi.blogspot.com

জিজ্ঞেস করবো আমরা, কী করে ক্যানসাসে ফেরা যায়।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো সে। চাবিটা সাবধানে ফ্রকের পকেটে রেখে দিলো।

অবশেষে শুরু হলো যাত্রা। ডরোথির পিছু পিছু টোটোও চুপচাপ এগিয়ে চললো।

অনেকগুলো রাস্তা রয়েছে সামনে। কিন্তু তার ভেতর থেকে হলদে ইট বিছানো রাস্তাটা খুঁজে নিতে ডরোথির কোনো অসুবিধে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-রাস্তা ধরে সাবলীল গতিতে এগিয়ে চললো সে পান্নানগরীর উদ্দেশে।

শক্ত হলুদ-রঙা ইটের ওপর ঠুন্‌ঠুন্ মিষ্টি আওয়াজ তুলছে ডরোথির রুপোর জুতো। সূর্য উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে, পাখিরা গান গাইছে মিষ্টি সুরে। নিজের দেশ ছেড়ে হঠাৎ করে অচেনা কোনো দুরের দেশে এসে ছোট একটা মেয়ের যতখানি খারাপ লাগবার কথা, ততখানি খারাপ ডরোথির এখন আর লাগছে না।

হাঁটতে হাঁটতে চারপাশের আশ্চর্য সুন্দর সব দৃশ্য দেখে ডরোথি মুগ্ধ হয়ে গেল। রাস্তার পাশ বরাবর ছিমছাম বেড়া, নিখুঁত নীল রঙের প্রলেপ দেয়া তাতে। বেড়ার ওপাশে মাঠভর্তি প্রচুর ফসল আর শাক-সবজি। সন্দেহ নেই, কৃষিকাজে খুব পটু মাঞ্চ্‌কিনেরা, অঢেল ফসল ফলাতে পারে। মাঝে মাঝে ডরোথি একেকটা বাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে। লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসছে তাকে দেখবার জন্যে, দুর থেকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। কারণ সবাই জানে, তারই ঘরের নিচে চাপা পড়ে ধ্বংস হয়েছে অত্যাচারী ডাইনী, তারই কারণে মাঞ্চ্‌কিনেরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। মাঞ্চ্‌কিনদের বাড়িগুলো অদ্ভুত ধরনের। প্রত্যেকটা বাড়ি গোলা-

কার, ছাদগুলো আসলে বড়ো আকারের একেকটা গম্বুজ ছাড়া আর কিছু নয়। আগাগোড়া নীল রঙে রঙ করা প্রতিটি বাড়ি পুবের এই রাজ্যে নীলই সবার প্রিয় রঙ।

যেতে যেতে একসময় বেলা পড়ে এলো। খুব ক্লান্ত বোধ করছে ডরোথি। রাতটা কোথায় কাটাবে, তা-ই ভাবছে। এমন সময় লক্ষ্য করলো, বেশ বড়োসড়ো একটা বাড়ির কাছে এসে পড়েছে সে। বাড়ির সামনের সবুজ চত্বরে অনেক নারীপুরুষ একসঙ্গে নাচছে। পাঁচজন খুদে বেহালাবাদক বেহালা বাজিয়ে চলেছে যতো জোরে সম্ভব। লোকজন মহানন্দে গান গাইছে, হাসছে। কাছেই বড়ো একটা টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো রয়েছে তাজা ফলমূল, নানারকম সুখাদ্য আর পানীয়ের সম্ভার।

ডরোথিকে দেখতে পেয়ে তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো সবাই। সেখানেই খেয়েদেয়ে তাদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে আমন্ত্রণ জানালো। ডরোথি শুনলো, এ-বাড়ির মালিক হচ্ছে এরাজ্যের সবচেয়ে ধনী মাঞ্চ্‌কিনদের একজন; অত্যাচারী ডাইনীর দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে উৎসব করছে।

ধনী মাঞ্চ্‌কিনের নাম বক্‌। সে স্বয়ং উপস্থিত থেকে ডরোথিকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করলো। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেলো ডরোথি। তারপর নরম গদিমোড়া একটা আসনে বসে নাচ দেখতে লাগলো।

তার রুপোর জুতোজোড়ার ওপর চোখ পড়তেই বক্‌ বলে উঠলো, 'তুমি নিশ্চয় মস্ত এক মায়াবিনী?'

'কেন ও-কথা বলছো?' ডরোথি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলো।

'রুপোর জুতো দেখছি তোমার পায়ে। তুমি দুষ্ট ডাইনীকেও

www.boiRboi.blogspot.com

মেরেছো। তাছাড়া, শাদা রঙ রয়েছে তোমার পোশাকে—শুধু মায়াবিনী আর জাদুকরীদের পোশাকই তো শাদা হয়।'

'আমার পোশাকে নীল, শাদা দুই-ই আছে,' কাপড়ের ভাঁজ সমান করতে করতে বললো ডরোথি, 'এই দেখো।'

'সে তোমার দয়া,' বললো বক্‌। 'নীল হলো মাঞ্চ্‌কিনদের প্রিয় রঙ, আর শাদা রঙ হলো মায়াবিনী-ডাইনীদের; কাজেই আমরা বুঝতে পারছি, তুমি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী মায়াবিনী।'

কী বলবে, ডরোথি ভেবে পেলো না। সবাই ভাবছে, সে আসলে মায়াবিনী একজন। কী করে বোঝাবে ওদের, আসলে সাধারণ একটা ছোট্ট মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয় ও?

নাচ দেখতে দেখতে ঘুম পেয়ে গেল ডরোথির। তখন বক্‌ তাকে বাড়ির ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেল। চমৎকার একটা বিছানা পাতা রয়েছে ঘরে। তার ওপর নীল চাদর বিছানো। সকাল পর্যন্ত অঘোরে ঘুমোলো ডরোথি। তার পাশে নীল কম্বলের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোলো টোটো।

ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ডরোথি সুস্বাদু নাশ্‌তা খেলো। খুব ছোট্ট একটা মাঞ্চকিন শিশুকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। টোটোর সঙ্গে খেললো বাচ্চাটা, তার লেজ ধরে টানাটানি করলো। তার মিহি গলার আওয়াজ আর হাসি শুনে দারুণ মজা পেলো ডরোথি। ওদিকে মাঞ্চ্‌কিনেরা সবাই টোটোকে খুঁটিয়ে দেখলো খুব কৌতূহলের সঙ্গে। আগে ওরা কোনদিন কুকুর দেখেনি।

'পান্নানগরী এখান থেকে কতদূর?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'জানি না,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলো বক্‌, 'আমি কখনো যাইনি সেখানে—খুব দরকার না হলে ওজের কাছ থেকে দূরে থাকাই

ভালো। তবে এটুকু বলতে পারি, এখান থেকে অনেক দূরে পান্না-নগরী ; যেতে অনেকদিন লাগবে তোমার। এ-রাজ্য খুব উর্বর আর সুন্দর দেখছো, কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে তোমাকে অনেক কঠিন বিপদসঙ্কুল জায়গা পাড়ি দিয়ে যেতে হবে।'

শুনে ডরোথি মনে মনে কিছুটা শঙ্কিত বোধ করলো। কিন্তু সে জানে, ক্যানসাসে ফিরে যেতে হলে মহাশক্তিমান ওজের কাছে গিয়ে সাহায্য চাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সাহসে বুক বেঁধে তাই ঠিক করলো, যতো বিপদই আসুক, পিছপা হবে না কিছুতেই।

মাঞ্চ্কিনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সে হলদে ইটের রাস্তা ধরে রওনা হলো। কয়েক মাইল যাবার পর ভাবলো, একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়া যাক। থেমে দাঁড়ালো এক জায়গায়। এদিক-ওদিক চেয়ে বসবার মতো কিছু দেখতে না পেয়ে রাস্তার পাশের বেড়ার ওপর উঠে বসলো। বেড়ার ওপাশে বিস্তীর্ণ শস্যখেত। অদূরে খেতের ভেতর লম্বা খুঁটির মাথায় বসানো রয়েছে একটা কাক-তাড়ুয়া। পাখিরা যাতে পাকা ফসল খেয়ে না যায়, সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

হাতের ওপর থুতনি রেখে ডরোথি একমনে কাকতাড়ুয়াটার দিকে চেয়ে রইলো। ছোট একটা থলের ভেতর খড় পুরে ওটার মাথা তৈরি করা হয়েছে। তার ওপর চোখ, নাক আর ঠোঁট এঁকে দিয়ে বানানো হয়েছে মুখ। পুরনো একটা সরু চুড়োওয়ালা নীল টুপি বসানো রয়েছে মাথার ওপর—নিশ্চয় কোনো মাঞ্চ্কিন পরতো ওটা একসময়। বাকি পুরো শরীর তৈরি হয়েছে নীল একপ্রস্থ পোশাকে ; পুরনো, বিবর্ণ কাপড়ের ভেতর ঠেসে ভর্তি করা হয়েছে একগাদা খড়। পায়ে একজোড়া পুরনো নীল জুতো—এ-রাজ্যের সব লোক ও-রকম

www.boiRboi.blogspot.com

জুতোই পরে। পিঠের সঙ্গে একটা দণ্ড জুড়ে দিয়ে মূর্তিটাকে খেতের ফসলের বেশ খানিকটা ওপরে লটকে রাখা হয়েছে।

ডরোথি খুব মনোযোগ দিয়ে কাকতাড়ুয়ার হাতে-আঁকা মুখটার দিকে চেয়ে ছিলো। হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সে। পরিষ্কার মনে হলো, তার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে একটা চোখ টিপলো মূর্তিটা। প্রথমে ডরোথি ভাবলো, ভুল দেখছে চোখে ; ক্যানসাসে কোনো কাকতাড়ুয়াকে তো কোনদিন চোখ টিপতে দেখেনি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে দেখলো, মূর্তিটা দিব্যি বন্ধুর মতো মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

এবার বেড়ার ওপর থেকে নেমে পড়লো ডরোথি। খেতের ভেতর দিয়ে পথ করে কাকতাড়ুয়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। টোটো খুঁটির চারপাশে ছুটোছুটি করে ঘেউঘেউ করতে লাগলো।

'সুপ্রভাত,' খসখসে গলায় বলে উঠলো কাকতাড়ুয়া।

'কথা বললে নাকি তুমি!' তাজ্জব হয়ে গেল ডরোথি।

'নিশ্চয়ই,' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো। 'কেমন আছো?'

'বেশ আছি—ধন্যবাদ,' নরম গলায় বললো ডরোথি। 'তুমি কেমন আছো?'

'ভালো নেই,' কাকতাড়ুয়া মুচকি হেসে বললো। 'কাক তাড়া-বার জন্যে দিনরাত এখানে এভাবে লটকে থাকতে ভারী বিশ্রী আর একঘেয়ে লাগে।'

'নেমে পড়তে পারো না?' ডরোথি জিজ্ঞেস করলো।

'নাহ্। এই যে একটা খুঁটি জুড়ে দেয়া আছে আমার পিঠের সঙ্গে। তুমি যদি ওটা সরিয়ে নিতে, আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতাম।'

ডরোথি দু'হাত বাড়িয়ে মূর্তিটাকে অনায়াসে খুঁটির মাথা থেকে

নামিয়ে আনলো। ভেতরে শুধু খড় পোরা, একেবারে হালকা তাই।

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মাটিতে পা ঠেকতেই বলে উঠলো কাকতাড়ুয়া। 'নতুন মানুষ মনে হচ্ছে এখন নিজেকে।'

ডরোথি হতভম্ব হয়ে পড়েছে। খড়-পোরা মানুষ কথা বলছে, মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, হাঁটছে তার পাশে পাশে—ভারী বিদঘুটে ব্যাপার!

আড়মোড়া ভাঙলো কাকতাড়ুয়া। হাই তুললো। 'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'কোথায় যাচ্ছো?'

'আমার নাম ডরোথি। পান্নানগরীতে যাচ্ছি আমি। ওখানে গিয়ে মহাশক্তিমান ওজের সঙ্গে দেখা করবো, আমাকে ক্যানসাসে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করবো তাকে।'

'পান্নানগরী কোথায়?' জানতে চাইলো কাকতাড়ুয়া। 'ওজ কে?'

'সেকি, জানো না তুমি?' বিস্মিত ডরোথি বললো।

'না, জানি না,' বিষণ্ণ স্বরে উত্তর দিলো কাকতাড়ুয়া। 'আসলে কিছুই জানি না আমি। দেখছো না, আমার শরীরে শুধু খড় পোরা, আমার তো মগজ বলতে কিছু নেই!'

'হ্যাঁ, তাই তো,' বললো ডরোথি, 'তোমার জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'আচ্ছা,' কাকতাড়ুয়া বললো, 'তোমার সঙ্গে পান্নানগরীতে যাই যদি, ওজ আমাকে খানিকটা মগজ দেবে না?'

'বলতে পারি না,' ডরোথি জবাব দিলো। 'তবে ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পারো তুমি। ওজ যদি তোমাকে মগজ না-ও দেয়, যেমন আছো তেমন তো অন্তত থেকে যেতে পারবে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করলো কাকতাড়ুয়া। গলা নামিয়ে প্রায়

www.boiRboi.blogspot.com

ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'শোনো, আমার হাত-পা শরীরের ভেতর খড় পোরা বলে দুঃখ নেই আমার। তাতে বরং সুবিধেই হয়—ব্যথা পাই না আমি। কেউ আমার পা মাড়িয়ে দেয় যদি, কিংবা ধরো, সুচ ঢুকিয়ে দেয় গায়ে, তাতে কিছুই যায়-আসে না—কারণ ওসব টের পাবার ক্ষমতাই নেই আমার। কিন্তু আমি চাই না, লোকে আমাকে বোকা বলুক। তোমাদের মাথার মতো আমার মাথা মগজ-ভর্তি না হয়ে যদি চিরকাল শুধু খড়-পোরা অবস্থায়ই থেকে যায়, তাহলে আমি শিখবো-পড়বো কী করে, বলো?'

'আমি বুঝতে পারছি তোমার দুঃখ,' ডরোথি বললো। কাকতাড়ুয়ার জন্যে সত্যি ভারী কষ্ট হচ্ছে তার। 'যদি আমার সঙ্গে যাও, ওজকে বলবো তোমার জন্যে যতোটা সম্ভব করতে।'

'ধন্যবাদ তোমাকে,' কৃতজ্ঞ স্বরে বললো কাকতাড়ুয়া।

হেঁটে রাস্তার ধারে চলে এলো দু'জন। ডরোথি কাকতাড়ুয়াকে বেড়া ডিঙোতে সাহায্য করলো। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে হলদে ইটের পথ ধরে পান্নানগরীর পথে রওনা হলো আবার।

দলের এই নতুন সদস্যকে টোটোর প্রথমে পছন্দ হলো না। খড়-পোরা মানুষটার চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো সে, তাকে শুঁকতে লাগলো। তার সন্দেহ, হয়তো ইঁদুরের বাসা আছে খড়ের ভেতর। বেচারা কাকতাড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে সে একটু পরপরই গর্‌গর্ করতে লাগলো।

'ভয় পেয়ো না টোটোকে,' নতুন বন্ধুর উদ্দেশে বললো ডরোথি, 'ও কখনো কামড়ায় না।'

'না না, আমি একটুও ভয় পাইনি,' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো। 'তাছাড়া খড় কামড়ে আর কী করবে। তোমার ঝুড়িটা আমার

হাতে দাও বরং। আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না—আমি তো ক্লান্ত হই না কখনো।' হাঁটতে হাঁটতে আবার ফিস্‌ফিস্ করে বললো সে, 'একটা গোপন কথা বলি তোমাকে : পৃথিবীতে মাত্র একটা জিনিস-কেই আমি ভয় পাই।'

'কী সেটা?' জানতে চাইলো ডরোথি। 'যে মাঞ্চ্‌কিন চাষী তোমাকে বানিয়েছিল, তাকে ভয় পাও?'

'না,' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো। 'জিনিসটা হলো : জ্বলন্ত দেশলাই।'

www.boiRboi.blogspot.com

পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত খুলনা

চার

ঘণ্টা কয়েক চলার পর ওরা দেখলো, পথের অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে শুরু করেছে। হলদে ইটগুলো এদিকে খুব উঁচুনিচু। হাঁটা এতো কঠিন হয়ে উঠলো যে কাকতাড়ুয়া বারবার হোঁচট খেতে থাকলো। কোথাও কোথাও ইটগুলো ভাঙা, কোথাও আবার ইট একেবারেই নেই—ফলে ছোটবড়ো গর্ত তৈরি হয়েছে রাস্তার ওপর। টোটো সেগুলো লাফ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, আর ডরোথি এগিয়ে চলেছে গর্তের পাশ দিয়ে ঘুরে। কিন্তু কাকতাড়ুয়ার মগজ নেই বলে সোজা নাক-বরাবর হেঁটে যাচ্ছে সে, গর্তের ভেতর পা দিয়ে ফেলছে অন্ধের মতো, অমনি শক্ত ইটের ওপর সটান হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। তাতে অবশ্য মোটেই ব্যথা লাগছে না তার—ডরোথি হাসতে হাসতে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, আর সে-ও নিজের বোকামিতে নিজেই মজা পেয়ে হেসে উঠছে।

পেছনে ফেলে আসা ফসলের খেতগুলোর মতো এ-অঞ্চলের খেতগুলো তেমন পরিপাটি নয়। এদিকে ঘরবাড়ির সংখ্যাও কম, ফলের গাছও তেমন একটা নেই। যতোই এগোচ্ছে ওরা, চারদিকটা ততোই রুক্ষ-শ্রীহীন আর নির্জন হয়ে উঠছে।

দুপুরের দিকে ওরা রাস্তার ধারে ছোট একটা নদীর তীরে বিশ্রাম

নিতে বসলো। ঝুড়ি খুলে রুটি বের করলো ডরোথি। একটুকরো রুটি কাকতাড়ুয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো কাকতাড়ুয়া। 'আমার কখনো খিদে পায় না,' জানালো সে। 'সেটা অবশ্য খুব ভাগ্যের কথা আমার জন্যে। আমার মুখ তো আসলে রঙ দিয়ে আঁকা; খাওয়ার জন্যে যদি মুখে একটা গর্ত কাটতে হতো, তাহলে খড় বেরিয়ে পড়তো ভেতর থেকে—কেমন বিশ্রী আকৃতি হয়ে পড়তো তখন আমার মাথার, ভাবো!'

ডরোথি দেখলো, কথাটা মিথ্যে নয়। আর কিছু না বলে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিয়ে সে একাই খেতে শুরু করলো।

'তোমার কথা কিছু বলো,' কাকতাড়ুয়া বললো ডরোথির খাওয়া শেষ হলে, 'যে-দেশ থেকে এসেছো, সেখানকার কথাও শোনাও আমাকে।'

ক্যানসাসের সব গল্প বললো ডরোথি। সেখানে কেমন ধুসর বিবর্ণ সবকিছু, তা-ও বললো কাকতাড়ুয়াকে। ঘূর্ণিবায়ু তাকে কেমন করে এই আজব দেশে বয়ে এনেছে, সে-কাহিনীও শোনালো।

কাকতাড়ুয়া মনোযোগ দিয়ে শুনলো সব। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'এই সুন্দর দেশ ছেড়ে তুমি কেন যে আবার ক্যানসাস নামের ওই রুক্ষ ধুসর দেশে ফিরে যেতে চাও, আমি বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছো না, কারণ তোমার মাথায় মগজ নেই,' ডরোথি জবাব দিলো। 'যতোই বিশ্রী হোক, ধুসর হোক নিজেদের দেশ, আমরা রক্তমাংসের মানুষেরা সেখানেই থাকতে চাই; অন্য কোনো দেশ আমাদের ভালো লাগে না, সে-দেশ যতোই সুন্দর হোক।

www.boiRboi.blogspot.com

নিজের দেশের সঙ্গে আর কোনো দেশের তুলনা হয় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কাকতাড়ুয়া।

'তা ঠিক, এসব বোঝার সাধ্য আমার নেই,' বললো সে। 'আমার মতো তোমাদের মাথায়ও যদি খড় পোরা থাকতো, তাহলে হয়তো তোমরা সবাই সুন্দর সুন্দর জায়গায় গিয়ে থাকতে চাইতে—আর ক্যানসাস তখন একেবারে ফাঁকা হয়ে যেতো। ক্যানসাসের ভাগ্য, তোমাদের মাথায় মগজ আছে।'

'এবার তোমার গল্প কিছু শোনাও না!' বললো ডরোথি।

কাকতাড়ুয়া করুণ মুখে চাইলো তার দিকে।

'এতো অল্পদিনের জীবন আমার যে সত্যি বলতে কি কিছুই জানি না আমি,' বললো সে। 'মাত্র গত পরশু আমাকে বানানো হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে কী ঘটেছে না ঘটেছে, কিছুই আমার জানা নেই। ভাগ্যের কথা, আমার মাথা তৈরি করার পর চাষী শুরুতেই আমার কান এঁকে দিয়েছিল। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের সমস্ত শব্দ আমার কানে আসতে শুরু করে। সেসময় আরেকজন মাঞ্চকিন ছিলো চাষীর সঙ্গে। শুনলাম, চাষী তাকে জিজ্ঞেস করছে, "কেমন হলো কানদু'টো বলো দেখি?"

'"সোজা হয়নি," অন্য লোকটা জবাব দিলো।

'"তাতে কী!" বললো চাষী। "কান তো হয়েছে ঠিকই।"

'কথাটা সে মিথ্যে বলেনি—আমি ভাবলাম।

'"এখন চোখ আঁকবো," বললো চাষী। আমার ডান চোখ আঁকলো সে। আঁকা শেষ হতে না হতেই তাকে দেখতে পেলাম আমি। তারপর দারুণ কৌতূহল নিয়ে চারপাশের সবকিছু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। দুনিয়াটাকে সে-ই প্রথম দেখছি কিনা!

' "চোখটা বেশ ভালোই হয়েছে," চাষীর কাজ দেখতে দেখতে অন্য মাঞ্চ্‌কিন মন্তব্য করলো। "চোখ আঁকার জন্যে নীলরঙই সব-চেয়ে ভালো।"

' "অন্য চোখটা একটু বড়ো করে আঁকবো ভাবছি," বললো চাষী।

'দ্বিতীয় চোখটা আঁকা হলে আমি আগের চেয়ে আরো অনেক ভালো দেখতে পেলাম। এরপর চাষী আমার নাক আর ঠোঁট আঁকলো। কিন্তু কোনো কথা বললাম না আমি, কারণ সেসময় আমার জানা ছিলো না, ঠোঁট নেড়ে কথা বলা যায়। আমার ধড়, হাত, পা সব বানাতে দেখলাম নিজের চোখে—বেশ মজা লাগলো দেখতে। শেষ পর্যন্ত যখন ওরা শরীরের সঙ্গে আমার মাথাটা জুড়ে দিলো, তখন ভারী গর্ব বোধ করলাম মনে মনে। ভাবলাম, কোনো তফাত নেই আর আমার অন্যসব মানুষের সঙ্গে।

' "খুব ভালো কাক তাড়াতে পারবে এ-ব্যাটা," চাষী বললো। "ঠিক মানুষের মতোই লাগছে দেখতে।"

' "মানুষ ছাড়া আবার কী!" অন্যজন বললো। মনে মনে ভাবলাম, খাঁটি কথা বলেছে লোকটা।

'চাষী আমাকে ফসলের খেতে নিয়ে গিয়ে লম্বা একটা খুঁটির মাথায় লটকে দিলো—সেখানেই আমাকে দেখেছো তুমি এসে। আমাকে ওখানে একা ফেলে রেখে চাষী আর তার বন্ধু একটু পরে চলে গেল।

'ওভাবে আমাকে ফেলে রেখে যাওয়ায় আমার খুব খারাপ লাগলো। ওদের পেছন পেছন হাঁটা দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পা দিয়ে মাটির নাগাল পেলাম না। কাজেই খুঁটির মাথায়ই লটকে

www.boiRboi.blogspot.com

থাকতে হলো। বড়ো নিঃসঙ্গ সে-জীবন। মাত্র একটু আগে তৈরি হয়েছি, চিন্তাভাবনারও কোনো খোরাক নেই। অনেক কাক আর অন্যান্য পাখি উড়ে এলো ফসলের খেতে, কিন্তু আমাকে দেখামাত্র সবাই আবার পাখা ঝাপটে পালিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, ওরা আমাকে একজন মাঞ্চ্‌কিন বলে ধরে নিয়েছে। খুশি হলাম মনে মনে। ভাবলাম, যেমন-তেমন লোক নই আমি, আর যা হোক।'

'একসময় কোত্থেকে এক বুড়ো কাক উড়ে এলো আমার কাছে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলো সে আমাকে। তারপর কাঁধের ওপর বসে বলে উঠলো: "কী করে ভাবলো চাষী, এতো সহজে আমাকে বোকা বানাতে পারবে! মাথায় বুদ্ধি থাকলে যে-কোনো কাক ধরে ফেলবে, তুমি শুধু খড় দিয়ে ঠাসা।" এরপর লাফ দিয়ে আমার পায়ের কাছে নেমে পড়লো সে। ইচ্ছেমতো ফসল খেয়ে চললো। আমি তার কোনো ক্ষতি করছি না দেখে অন্যসব পাখিও সাহস পেয়ে উড়ে এসে ফসল খেতে শুরু করলো। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চারপাশে ঝাঁক ঝাঁক পাখির ভিড় জমে উঠলো।

'মনটা খুব দমে গেল। বুঝলাম, আসলে খুব ভালো কাকতাড়ুয়া আমি নই। এমন সময় বুড়ো কাকটা এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললো: "শুধু যদি মগজ থাকতো তোমার মাথায়, রক্তমাংসের যে-কোনো মানুষের মতোই হতে পারতে তুমি—চাই কি, অনেকের চেয়ে ভালো মানুষই হতে পারতে। এ-জগতে দামী জিনিস বলতে আছে শুধু ওই মগজই—সে তুমি কাকই হও, আর মানুষই হও।"

'কাকের দল চলে গেলে কথাগুলো নিয়ে আমি অনেক ভাবলাম। শেষে ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক, খানিকটা মগজ আমাকে যোগাড় করতে হবে। আমার সৌভাগ্য, তুমি এসে পড়লে আজ

হঠাৎ, আমাকে খুঁটির মাথা থেকে নামিয়ে নিলে। তুমি যা বলছো তাতে আমার স্থির বিশ্বাস, পান্নানগরীতে গিয়ে পৌঁছুলেই মহা-শক্তিমান ওজ আমাকে খানিকটা মগজ দিয়ে দেবে।'

'আমিও তা-ই আশা করি,' ডরোথি আন্তরিকভাবে বললো, 'মনে মনে যখন এতো করে চাইছো তুমি জিনিসটা, নিশ্চয় পাবে!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—সত্যি চাই, খুব চাই,' কাকতাড়ুয়া বলে উঠলো। 'আমি লোকটা নির্বোধ—একথা ভাবতে এমন বিচ্ছিরি লাগে!'

'ঠিক আছে, এবার যাই চলো,' বলে উঠে দাঁড়ালো ডরোথি। ঝুড়িটা বাড়িয়ে দিলো কাকতাড়ুয়ার দিকে।

এখন রাস্তার ধারে আদৌ কোনো বেড়া নেই। দু'পাশে এবড়ো-খেবড়ো পতিত জমি। হাঁটতে হাঁটতে বিকেলের দিকে ওরা এক বিশাল বনের ভেতর এসে পড়লো। বনের গাছগুলো এতো প্রকাণ্ড আর ঘন যে দু'পাশের ডালপালা হলদে ইটের রাস্তার ওপর এসে এক হয়ে মিলেমিশে উঁচু ছাউনির মতো তৈরি করেছে। ডালপালা ভেদ করে দিনের আলো আসবার উপায় নেই, ফলে বনের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে। কিন্তু ওরা থামলো না। এগিয়ে চললো বনের ভেতর দিয়ে।

'পথটা যখন বনের ভেতরে ঢুকেছে, তখন নিশ্চয় একসময় বাইরেও বেরোবে,' বললো কাকতাড়ুয়া। 'আর এ-পথের শেষ মাথাতেই যখন পান্নানগরী, তখন যেদিক দিয়েই যাক না কেন রাস্তাটা, আমরা এগোতেই থাকবো।'

'সে তো জানা কথা,' বললো ডরোথি, 'যে-কেউ বুঝবে।'

'অবশ্যই—সেজন্যেই বুঝেছি আমি,' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো। 'কথাটা বুঝতে যদি মগজের দরকার হতো, তাহলে কি আর আমি

www.boiRboi.blogspot.com

বলতে পারতাম ওভাবে?'

আলো কমতে কমতে ঘন্টাখানেকের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললো ওরা। ডরোথি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু টোটোর একটুও অসুবিধে হচ্ছে না দেখতে—কোনো কোনো কুকুর অন্ধকারে খুব ভালোভাবে দেখতে পায়। কাকতাড়ুয়া জানালো, সে দিনের বেলায় যেমন দেখতে পায় সেরকমই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। তার একখানা হাত ধরে ডরোথি মোটামুটি ভালোভাবেই এগিয়ে চললো।

'যদি কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ে তোমার, কিংবা রাত কাটাবার মতো কোনো জায়গা দেখতে পাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বলবে আমাকে,' হাঁটতে হাঁটতে কাকতাড়ুয়াকে বললো ডরোথি। 'অন্ধকারে পথ চলতে ভারী বিশ্রী লাগছে।'

একটু পরেই কাকতাড়ুয়া থেমে দাঁড়ালো।

'আমাদের ডানদিকে ছোট একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি,' বলে উঠলো সে, 'গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে তৈরি। যাবো ওদিকে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—চলো,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ডরোথি, 'খুব ক্লান্ত লাগছে আমার।'

কাকতাড়ুয়া তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো গাছপালার ভেতর দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা কুটিরের কাছে এসে পড়লো। ভেতরে ঢুকে ঘরের এককোণে শুকনো পাতার তৈরি একটা বিছানা পেলো ডরোথি। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লো সে, একটু পরেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। টোটো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইলো তার পাশে।

কাকতাড়ুয়ার ক্লান্তি বলে কিছু নেই। ঘরের আরেক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে সকাল হওয়ার অপেক্ষায়।

পাঁচ

যখন ডরোথির ঘুম ভাঙলো, তখন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে মাটিতে। অনেক আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে টোটো, চারপাশে পাখিদের পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। তবে কাকতাড়ুয়া এখনও ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের কোণে—অপেক্ষা করছে, কখন ডরোথি ঘুম থেকে উঠবে।

'বাইরে বেরিয়ে দেখতে হবে, কোথায় পানি পাওয়া যায়,' কাকতাড়ুয়ার কাছে এসে বললো ডরোথি।

'পানি দিয়ে কী হবে ?' জিজ্ঞেস করলো কাকতাড়ুয়া।

'মুখ ধুতে হবে—রাস্তার ধুলো লেগে আছে মুখে। তাছাড়া খেতেও হবে পানি, নয়তো শুকনো রুটি গলায় আটকে যাবে।'

'রক্তমাংসের মানুষ হওয়ার ঝক্কি দেখছি কম নয়,' কাকতাড়ুয়া গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলো। 'ঘুমোও, খাবার খাও, পানি খাও। তবে কিনা, তোমার মাথায় মগজ আছে। স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা থাকে যদি, তাহলে অনেককিছুই মেনে নেয়া যায় তার বিনিময়ে।'

কুটির ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ জলের সরু একটা ঝরনা খুঁজে

www.boiRboi.blogspot.com

পেলো বনের ভেতর। জল পান করলো ডরোথি, স্নান সারলো, তারপর ঝরনার ধারে বসে নাশতা খেয়ে নিলো। দেখলো, ঝুড়িতে রুটি আর বেশি নেই। ভাগ্যিস কাকতাড়ুয়াকে কিছু খেতে হয় না, ভাবলো সে মনে মনে—রুটি যেটুকু আছে তাতে তার এবং টোটোর সারাদিন চলবে কিনা সন্দেহ।

খাওয়া শেষ হলে উঠে পড়লো সে। হলদে ইটের রাস্তার দিকে রওনা হবে, হঠাৎ একটা চাপা গোঙানি শোনা গেল অদূরে।

চমকে উঠলো ডরোথি। 'ও কী !' ফিস্‌ফিস্ করে বললো সে।

'আমার তো অনুমান করার শক্তি নেই,' কাকতাড়ুয়া উত্তর দিলো, 'তবে গিয়ে দেখে আসা যেতে পারে।'

ঠিক সে-সময় আবার গোঙানির শব্দ ভেসে এলো ওদের কানে। মনে হলো, পেছনদিক থেকে আসছে আওয়াজটা। ঘুরে দাঁড়ালো ওরা। বনের ভেতর দিয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ ডরোথি দেখতে পেলো, গাছের পাতার ফাঁক গ'লে আসা একঝলক রোদে কী যেন চক্‌চক্ করছে। একছুটে সেদিকে এগিয়ে গেল সে, পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বিস্ময়ের অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে।

বড়োসড়ো একটা গাছের মোটা গুঁড়ির খানিকটামাত্র কাটা হয়েছে, আর তার পাশে দু'হাতে শূন্যে কুড়ুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগাগোড়া টিনের তৈরি অদ্ভুত একজন মানুষ। তার মাথা আর হাত-পা ধড়ের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দেয়া যে দেখে মনে হয়, ওগুলো সে ইচ্ছেমতো নাড়তে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন একবিন্দু নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই।

ডরোথি অবাক বিস্ময়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। কাক-

তাড়ুয়ারও একই অবস্থা। কিন্তু টোটো তীক্ষ্ণ স্বরে ঘেউঘেউ করতে করতে ছুটে গিয়ে আজব লোকটার টিনের পায়ে কামড় বসিয়ে দিলো; পরমুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠলো দাঁতে ব্যথা পেয়ে।

'তুমিই কি অমন করে কাতরাচ্ছিলে?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ,' ফাঁপা ধাতব গলায় জবাব দিলো টিনের তৈরি লোকটা, 'আমিই। এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল, এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঙাচ্ছি আমি। কেউ আমার আর্তনাদ শুনতে পায়নি এতদিন, আমাকে সাহায্য করতেও আসেনি।'

'কী করতে পারি আমি তোমার জন্যে?' নরম গলায় জানতে চাইলো ডরোথি। লোকটার বিষণ্ণ কণ্ঠ শুনে তার মন সহানুভূতিতে ছেয়ে গেছে।

'তেলের টিন এনে আমার শরীরের জোড়গুলোতে খানিকটা করে তেল লাগিয়ে দাও,' টিনের মানুষ জবাব দিলো। 'আমার সমস্ত গাঁটে এমন মরচে পড়ে গেছে যে একটুও নড়াচড়া করতে পারছি না। গাঁটগুলোতে ভালো করে তেল দিয়ে দিলে আমি আবার পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবো। আমার কুটিরে তাকের ওপর আছে তেলের টিন।'

সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে কুটিরে চলে গেল ডরোথি। তেলের টিন নিয়ে ফিরে এলো আবার। দ্রুত জানতে চাইলো, 'কোথায় কোথায় জোড় তোমার?'

'আগে আমার ঘাড়ে খানিকটা তেল দাও,' টিনের কাঠুরে বললো।

তা-ই করলো ডরোথি। কিন্তু এতো বেশি মরচে ধরেছে কাঠুরের ঘাড়ে যে শুধু তেল ঢেলে কাজ হলো না। কাকতাড়ুয়া টিনের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক ঘোরাতে

www.boiRboi.blogspot.com

শুরু করলো। ঘাড়ের নড়াচড়া সহজ হয়ে এলে ছেড়ে দিলো মাথা। দেখা গেল, এবার কাঠুরে নিজেই অনায়াসে যেমন ইচ্ছে মাথা নাড়তে পারছে।

'এবার আমার হাতের জোড়গুলোতে তেল দাও,' বললো সে।

একে একে কাঠুরের দু'হাতে সমস্ত গাঁটে তেল দিলো ডরোথি। কাকতাড়ুয়া হাতদু'টো ধরে সাবধানে নানাভাবে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলো। মরচে দূর হয়ে গেল একেবারে, নতুনের মতো হয়ে গেল টিনের কাঠুরের হাত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে মাথার ওপর থেকে কুড়ুল নামিয়ে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখলো।

'বাঁচলাম,' বললো কাঠুরে। 'মরচে ধরে দু'হাত অচল হয়ে গিয়েছিল সে কবেকার কথা, সেই থেকে ওই কুড়ুল শূন্যে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। শেষ পর্যন্ত যে ওটা নামাতে পারলাম, কম কথা নয়। এবার আমার পায়ের জোড়গুলোতে তেল লাগিয়ে দিলেই একদম ঠিক হয়ে যাবো আবার।'

পায়ের গাঁটে তেল দিয়ে দেবার পর টিনের কাঠুরের পা-দু'টোও সচল হয়ে উঠলো। জড় অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সে বারবার ডরোথি আর কাকতাড়ুয়াকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো, কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো। খুব নম্র এবং বিনয়ী বলে মনে হলো তাকে।

'তোমরা যদি এসে না পড়তে তাহলে হয়তো আমাকে চিরকাল ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো,' বললো সে, 'কাজেই তোমরা আমার জীবন বাঁচিয়েছো বললে মোটেই ভুল বলা হবে না। কী করে এলে তোমরা এখানে বলো তো?'

'আমরা পান্নানগরীতে যাচ্ছি, মহাশক্তিমান ওজের সঙ্গে দেখা করতে,' ডরোথি উত্তর দিলো। 'রাত কাটাবার জন্যে তোমার ঘরে

আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা।'

'ওজের সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন?' টিনের কাঠুরে জানতে চাইলো।

'আমি তাকে অনুরোধ করবো আমাকে ক্যানসাস ফেরত পাঠাতে, আর কাকতাড়ুয়া তার কাছে চাইবে খানিকটা মগজ,' ডরোথির উত্তর।

কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলো টিনের কাঠুরে। তারপর বললো:

'তোমার কি মনে হয় ওজ আমাকে একটা হৃৎপিণ্ড দিতে পারবে?'

'পারবে বলেই তো মনে হয়,' ডরোথি বললো। 'কাকতাড়ুয়াকে মগজ দিতে পারলে তোমাকে কেন হৃৎপিণ্ড দিতে পারবে না?'

'তা ঠিক,' বললো টিনের কাঠুরে। 'তাহলে, তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমাকে দলে নিতে, আমিও যাবো পান্নানগরীতে—ওজের কাছে হৃৎপিণ্ড চাইবো।'

'এসে পড়ো,' আন্তরিক আমন্ত্রণ জানালো কাকতাড়ুয়া।

ডরোথিও জানালো, কাঠুরের সঙ্গ পেলে তার ভালোই লাগবে।

কাজেই কুড়ুলটা কাঁধে ফেলে টিনের কাঠুরে ওদের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হলদে ইটের রাস্তায় গিয়ে উঠলো সবাই।

টিনের কাঠুরে ডরোথিকে তেলের টিনটা তার ঝুড়িতে নিয়ে নিতে অনুরোধ করেছে। 'হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে যদি আবার আমার জোড়-গুলোতে মরচে ধরে যায়, সাংঘাতিক দরকার হবে তখন তেলের টিনটা,' বলেছে সে।

দলে এই নতুন সঙ্গী যোগ হওয়ায় লাভই হলো বলতে হবে। আবার যাত্রা শুরু করার কিছুক্ষণ পরই ওরা এক জায়গায় এসে

www.boiRboi.blogspot.com

দেখতে পেলো, ঘন গাছপালা-ঝোপজঙ্গলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোনো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। টিনের কাঠুরে সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুল নিয়ে কাজে নেমে পড়লো। ঝোপঝাড় ডালপালা কেটে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে সবার যাবার মতো সরু একটা পথ তৈরি করে ফেললো।

আবার হাঁটতে শুরু করলো সবাই। ডরোথি গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলো। সে খেয়ালই করেনি, কখন কাকতাড়ুয়া গর্তে পা ফেলে হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে রাস্তার একধারে চলে গেছে। কাকতাড়ুয়ার চিৎকার শুনে সংবিৎ ফিরলো তার। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে তাকে টেনে তুলে দাঁড় করালো।

'গর্তের পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে পারলে না?' টিনের কাঠুরে বলে উঠলো।

'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই তেমন,' কাকতাড়ুয়া অম্লান বদনে জবাব দিলো। 'আমার মাথা তো শুধু শুকনো খড়ে ঠাসা—সেজন্যেই ওজের কাছে যাচ্ছি খানিকটা মগজ চাইতে।'

'ও, আচ্ছা,' বললো টিনের কাঠুরে। 'তবে কি জানো, দুনিয়ায় সেরা জিনিস আসলে মগজ নয়।'

'তোমার আছে মগজ?' কাকতাড়ুয়ার প্রশ্ন।

'না, আমার মাথা একেবারে ফাঁকা,' জানালো টিনের কাঠুরে। 'তবে একসময় আমার মগজও ছিলো, হৃৎপিণ্ডও ছিলো। দু'টোই পরখ ক'রে দেখে বুঝেছি, আমার আসলে চাই হৃৎপিণ্ড।'

'কেন?' বললো কাকতাড়ুয়া।

'আমার ইতিহাস বলছি শোনো, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে।'

বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টিনের কাঠুরে তার জীবনের

কাহিনী বলতে শুরু করলো :

'আমার জন্ম এক কাঠুরের ঘরে। আমার বাবা বনের গাছ কেটে কাঠ বিক্রি করে সংসার চালাতো। বড়ো হয়ে আমিও কাঠুরে হলাম। বাবা মারা যাওয়ার পর বৃদ্ধা মা যতদিন বেঁচে ছিলো ততদিন আমি তার দেখাশোনা করেছি। মা মারা গেলে ঠিক করলাম, একা একা জীবন না কাটিয়ে বিয়ে করবো—যাতে নিঃসঙ্গতার কষ্ট থেকে মুক্তি পাই।

'এক মাঞ্চ্‌কিন মেয়েকে চিনতাম আমি। ভারী সুন্দর ছিলো সে দেখতে। আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি—সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে ভালোবাসতে থাকি। সে আমাকে কথা দেয়, তার জন্যে ভালো একটা বাড়ি তৈরি করে দেয়ার মতো যথেষ্ট টাকা আমি উপার্জন করতে পারলেই সে আমাকে বিয়ে করবে। আমি তাই টাকা রোজগারের জন্যে কঠিন পরিশ্রম করতে শুরু করি। কিন্তু এক স্বার্থপর বুড়ির সঙ্গে থাকতো মেয়েটা—বুড়ি চাইতো না, সে কাউকে বিয়ে করুক। দারুণ অলস ছিলো বুড়ি। সে চাইতো, মেয়েটা চিরকাল তার কাছে থাকবে, তাকে রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, ঘরের সমস্ত কাজকর্ম করবে। পূর্বরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীর কাছে গিয়ে ধরনা দিলো সে। বললো, বিয়েটা পণ্ড করে দিতে পারলে সে ডাইনীকে দু'টো ভেড়া আর একটা গরু দেবে। ডাইনী তখন গোপনে আমার কুড়ুলে মন্ত্র পড়ে দিলো। নতুন বাড়ি আর নতুন বউ পাবার আশায় আমি যখন একদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাঠ কেটে চলেছি, হঠাৎ হাত থেকে ফসকে গেল কুড়ুলটা, ছুটে এসে আঘাত হানলো আমার বাঁ পায়ে—পা কেটে পড়ে গেল।

'নিজের এই দুর্ভাগ্যে প্রথমে খুব মুষড়ে পড়লাম। কারণ এ তো

www.boiRboi.blogspot.com

জানা কথা, এক পা-ওয়ালা একজন মানুষের পক্ষে কাঠ কাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে এক টিন-মিস্ত্রির কাছে গিয়ে তাকে দিয়ে একখানা নতুন টিনের পা তৈরি করিয়ে নিলাম আমি। নকল পায়ে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর সেটা বেশ ভালোই কাজ দিতে লাগলো। কিন্তু আমার এই কাণ্ড দেখে পূর্ব-রাজ্যের দুষ্ট ডাইনী ভয়ানক চটে গেল; কারণ বুড়িকে সে কথা দিয়েছে, আমার সঙ্গে সুন্দরী মাঞ্চ্‌কিন মেয়ের বিয়ে সে কিছুতেই হতে দেবে না। কাঠ কাটবার সময় আবার একদিন হঠাৎ ফসকে গেল আমার কুড়ুল, আমার ডান পা কেটে পড়ে গেল। আবার গেলাম টিন-মিস্ত্রির কাছে, টিন দিয়ে সে আবার একখানা পা বানিয়ে দিলো আমাকে। এরপর মন্ত্রপড়া কুড়ুলের ঘায়ে একে একে আমার দু'খানা হাতই কাটা গেল। কিন্তু তাতেও না দ'মে আমি টিনের হাত তৈরি করিয়ে নিলাম। এবার ডাইনীর চক্রান্তে কুড়ুল ফসকে আমার আস্ত মাথাটাই কেটে পড়ে গেল। প্রথমে ভাবলাম, সব শেষ, আর আশা নেই। কিন্তু খবর পেয়ে টিন-মিস্ত্রি নিজেই এসে হাজির হলো এবার, টিন দিয়ে আমার নতুন একটা মাথা তৈরি করে দিলো।

'ভাবলাম, দুষ্ট ডাইনীকে পরাস্ত করেছি শেষ পর্যন্ত, তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। নতুন উদ্যমে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে শুরু করলাম আবার। কিন্তু আমি জানতাম না, কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে আমার শত্রু। সুন্দরী মাঞ্চ্‌কিন মেয়ের প্রতি আমার ভালো-বাসা নিঃশেষে মুছে দেয়ার জন্যে ডাইনী নতুন এক কৌশল খাটালো। তার জাদুর বলে আবারও ফসকে গেল আমার কুড়ুল, সোজা আমার শরীর ভেদ করে চলে গেল সেটা, দু'ফাঁক হয়ে গেল গোটা ধড়। আবার টিন-মিস্ত্রি এলো আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। টিনের

একটা ধড় তৈরি করে তার সঙ্গে সে আমার টিনের হাত, পা, মাথা সব এমনভাবে জুড়ে দিলো যাতে সেগুলো ইচ্ছেমতো নাড়ানো যায়। ফলে আবার সচল হয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু হায়। হৃৎপিণ্ড ব'লে আর কিছু থাকলো না আমার, মাঞ্চ্কিন মেয়ের প্রতি আমার সমস্ত ভালোবাসা কোথায় হারিয়ে গেল! তাকে বিয়ে করা কিংবা না করার কোনো ভাবনাই আর আমার মনে রইলো না। হয়তো সে আজও রয়ে গেছে সেই বুড়ির সঙ্গে, আজো আমার পথ চেয়ে আছে।

'কোনো দুঃখও রইলো না আমার। রোদে কী চমৎকার ঝক্‌ঝক্ করে টিনের শরীর—দেখে আমার রীতিমতো গর্ব হয়। কুড়ুল ফসকে গেলেও আর কিছু আসে যায় না, জখম হবার কোনো ভয় নেই। ভেবে দেখলাম, একটাই মাত্র বিপদ হতে পারে এরপর—আমার গাঁটগুলোতে মরচে ধরে যেতে পারে। তাই একটা তেলের টিন রাখলাম ঘরে; যখনই দরকার হয়, শরীরের প্রত্যেকটা জোড়ে তেল লাগিয়ে নিই। একবার সময়মতো তেল দিতে ভুলে গেলাম, বিপদও এলো ঠিক তখনই। বনে কাঠ কাটছিলাম, সাবধান হওয়ার আগেই ঝড়বৃষ্টির ভেতর পড়ে গেলাম, মরচে ধরে গেল শরীরের সমস্ত গাঁটে। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে বনের ভেতর অনড় দাঁড়িয়ে রইলাম।

'বহুদিন পর শেষ পর্যন্ত তোমরা এসে আমাকে উদ্ধার করলে। ভোগান্তি হয়েছে সাংঘাতিক, কিন্তু এক বছর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমি অনেক ভাববার সুযোগ পেয়েছি। ভেবেচিন্তে দেখেছি, সবচেয়ে বড়ো যে-ক্ষতি হয়েছে আমার তা হলো, আমি হৃৎপিণ্ড হারিয়েছি। মাঞ্চ্কিন মেয়েটাকে যখন ভালোবাসতাম, তখন আমি ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। কিন্তু হৃৎপিণ্ড নেই যার, সে

কী করে ভালোবাসবে? সেজন্যেই আমি ঠিক করেছি, ওজের কাছে গিয়ে একটা হৃৎপিণ্ড চাইবো। যদি হৃৎপিণ্ড দেয় সে, আমি ফিরে যাবো সেই মাঞ্চ্কিন মেয়ের কাছে, তাকে বিয়ে করবো।'

ডরোথি এবং কাকতাড়ুয়া দু'জনই টিনের কাঠুরের গল্প খুব কৌতূহলের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনলো। নতুন একটা হৃৎপিণ্ড পাওয়ার জন্যে কাঠুরে কেন এতো ব্যাকুল, এতক্ষণে বুঝলো তারা।

'সে যা-ই হোক,' কাকতাড়ুয়া বললো, 'আমি হৃৎপিণ্ড না চেয়ে মগজই চাইবো। মানুষ যদি নির্বোধ হয় তো হৃৎপিণ্ড থাকলেই বা কী করবে সেটা দিয়ে?'

'আমি হৃৎপিণ্ডই চাইবো,' টিনের কাঠুরে বললো আবার। 'মগজ জিনিসটা জীবনে সুখ দিতে পারে না—অথচ সুখই হচ্ছে জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিস।'

ডরোথি কিছু বললো না। তার দুই বন্ধুর মধ্যে কার কথা ঠিক, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত মনে মনে ভাবলো, সে নিজে যদি শুধু ক্যানসাসে এম কাকীর কাছে ফিরে যেতে পারে, তাহলেই আর এসব নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা তার থাকবে না। কাঠুরের যদি মগজ না থাকে, কিংবা যদি হৃৎপিণ্ড না থাকে কাকতাড়ুয়ার, অথবা যে যা চাইছে তা-ই যদি পেয়ে যায়—কিছুই তার তেমন চিন্তার বিষয় হচ্ছে না।

এ মুহূর্তে তার সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাবনার বিষয় হলো, রুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সে এবং টোটো আর একবেলা খেলেই ঝুড়ি শূন্য হয়ে যাবে। কাঠুরে কিংবা কাকতাড়ুয়াকে কখনো কিছু খেতে হয় না। কিন্তু সে তো আর টিন বা খড়ের তৈরি নয়—খাবার না খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

www.boiRboi.blogspot.com

ছয়

ডরোথি আর তার সঙ্গীরা এতক্ষণে একবারও হাঁটা থামায়নি। ঘন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটানা। আগের মতোই হলদে ইট বিছানো রয়েছে রাস্তায়, তবে বেশির ভাগ ইট ঢাকা পড়ে আছে শুকনো ডালপালা আর ঝরা পাতার নিচে। হাঁটতে তাই এখন বেশ অসুবিধা হচ্ছে।

বনের এদিকটায় পাখির সংখ্যা খুব কম ; পাখিরা পছন্দ করে খোলামেলা জায়গা, যেখানে রোদ আছে প্রচুর। তবে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে থাকা বন্য জন্তুর গম্ভীর গর্জন ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। কিসের গর্জন জানে না ডরোথি, ভয়ে তার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। টোটো বুঝতে পারছে কিসের আওয়াজ—ডরোথির গা ঘেঁষে রয়েছে সে, ঘেউঘেউ পর্যন্ত করছে না।

'আর কতক্ষণ লাগবে বন থেকে বেরোতে ?' ডরোথি টিনের কাঠুরের কাছে জানতে চাইলো।

'বলতে পারি না,' কাঠুরের উত্তর। 'পান্নানগরীতে কখনো যাইনি আমি। তবে আমার বাবা একবার গিয়েছিল—তখন খুব ছোট ছিলাম আমি। বাবা বলেছিল, যে-নগরীতে থাকে ওজ, তার চার-পাশের এলাকা বেশ সুন্দর, কিন্তু সেখানে যেতে হয় ভয়ঙ্কর সব

www.boiRboi.blogspot.com

জায়গার ভেতর দিয়ে বহু পথ পাড়ি দিয়ে। তবে যতক্ষণ তেলের টিন আছে সঙ্গে, আমি কোনকিছুর পরোয়া করি না। কাকতাড়ুয়ারও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, খড়ভর্তি শরীর তার—বিপদ হবে কিসে ? আর তোমার কপালে রয়েছে উত্তরের ডাইনীর চুমুর চিহ্ন, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

'কিন্তু, টোটো ?' উৎকণ্ঠিত স্বরে বললো ডরোথি, 'সে কী করে বাঁচবে বিপদ থেকে ?'

'সে বিপদে পড়লে আমরাই বাঁচাবো,' জবাব দিলো টিনের কাঠুরে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই ভয়ঙ্কর একটা গর্জন উঠলো অদূরে জঙ্গলের ভেতর, পরমুহূর্তে মস্তবড়ো এক সিংহ একলাফে রাস্তার ওপর এসে পড়লো। তার থাবার এক প্রচণ্ড ঘায়ে কাকতাড়ুয়া পাক খেতে খেতে ছিটকে পড়লো রাস্তার কিনারায়। তারপরই জানোয়ারটা ধারালো নখ দিয়ে থাবা মারলো টিনের কাঠুরের গায়ে। আঁচড় পর্যন্ত লাগলো না শক্ত টিনে—সিংহ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কাঠুরে অবশ্য টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল রাস্তার ওপর, চুপচাপ শুয়ে রইলো।

শত্রুর মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই দেখে খুদে টোটো ঘেউঘেউ করতে করতে সিংহের দিকে ছুটে গেল। অমনি প্রকাণ্ড জন্তুটা হাঁ করে কামড়াতে এলো কুকুরটাকে।

টোটোর প্রাণ যায় দেখে উদ্বিগ্ন ডরোথি বিপদ অগ্রাহ্য করে ছুটে গেল সামনে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সিংহের নাকের ওপর একটা চড় বসিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো :

'টোটোকে কামড়াবে না, খবরদার ! এতবড়ো একটা জানোয়ার

হয়ে ওইটুকু কুকুরকে কামড়াতে লজ্জা করে না তোমার!'

'কই, কামড়াইনি তো,' নাকে থাবা ঘষতে ঘষতে অপ্রস্তুত সিংহ জবাব দিলো।

'কামড়াওনি, কিন্তু আরেকটু হলেই কামড়াতে যাচ্ছিলে তো!' ডরোথি ঝাঁঝের সঙ্গে বললো। 'আস্ত একটা কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু নও তুমি!'

'জানি,' লজ্জায় মাথা নুইয়ে সিংহ জবাব দিলো, 'সে আমি গোড়া থেকেই জানি। কিন্তু কী করবো বলো?'

'তা আমি কী করে বলবো? আশ্চর্য! খড় পোরা একটা অসহায় কাকতাড়ুয়াকে কিনা তুমি অমন করে থাবা মেরে ফেলে দিলে!'

'খড়ে পোরা নাকি ও?' সিংহ তাজ্জব বনে গেল। কাকতাড়ুয়ার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রইলো সে।

'নয়তো কী?' বললো ডরোথি। রাগ পড়েনি তার এখনও। কাকতাড়ুয়াকে তুলে দাঁড় করিয়ে তার শরীরের এখানে-ওখানে থাপড়ে গড়ন ঠিক করে দিতে লাগলো।

'আচ্ছা—তাই তো থাবা মারতেই উল্টে পড়ে গেল!' মন্তব্য করলো সিংহ। 'অমন বোঁ-বোঁ করে পাক খেতে দেখে ভারী অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ওই লোকটাও খড় পোরা নাকি?'

'না,' ডরোথি বললো, 'ও টিনের তৈরি।' টিনের কাঠুরেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো সে।

'সেজন্যেই তো আমার নখগুলো ভেঙে গিয়েছিল প্রায়,' বললো সিংহ, 'টিনের ওপর নখের আঁচড় পড়তেই গা শিউরে উঠেছে একেবারে। আর, তোমার অতো আদরের ওই যে ছোট্ট জন্তুটা দেখছি—কী ওটা?'

'আমার কুকুর, টোটো,' ডরোথি জানালো।

'টিনের তৈরি?—নাকি খড় পোরা?' বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করলো সিংহ।

'টিনেরও নয়, খড়েরও নয়। ও হলো গিয়ে…মাংসের তৈরি কুকুর,' ডরোথি বললো।

'তাই নাকি! ভারী মজার জন্তু তো! এখন তাকিয়ে কিন্তু সত্যি খুব ছোট মনে হচ্ছে। ওইটুকু একটা প্রাণীকে কামড়াবার কথা আমার মতো কাপুরুষ ছাড়া আর কে ভাববে!' সিংহের গলায় বিষাদ।

'কিন্তু কাপুরুষ হওয়ার কারণ কী তোমার?' ডরোথি প্রশ্ন করলো। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে প্রকাণ্ড সিংহের দিকে। আকারে ছোটখাটো একটা ঘোড়ার সমান হবে জানোয়ারটা।

'সে এক রহস্য,' সিংহ জবাব দিলো। 'আমার মনে হয়, ভীরু হয়েই জন্মেছি আমি। অথচ বনের অন্যসব প্রাণী স্বাভাবিকভাবেই চায়, আমি পশুদের রাজা হই। আমি দেখেছি, আমি যদি জোরে হুঙ্কার ছাড়ি, সমস্ত প্রাণী ভয় পেয়ে আমার সামনে থেকে পালিয়ে যায়। যখনই আমি কোনো মানুষের সামনে পড়েছি, ভয়ানক ঘাবড়ে গেছি মনে মনে, কিন্তু আমি গর্জন করে উঠতেই মানুষ ছুটে পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে। বনের বাঘ-ভালুক কিংবা হাতী যদি কখনো লড়াই করবার জন্যে রুখে দাঁড়াতো, তাহলে কিন্তু আমিই পালিয়ে বাঁচতাম—এমনই ভীতু আমি। কিন্তু আমি হুঙ্কার দিলেই সরে পড়ে সবাই, আর আমিও রেহাই পেয়ে যাই তার ফলে।'

'কিন্তু সেটা তো ঠিক নয়,' কাকতাড়ুয়া বলে উঠলো, 'কাপুরুষ হওয়া পশুরাজের মানায় না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'জানি,' লেজের ডগা দিয়ে চোখের কোণ থেকে একফোঁটা জল মুছে নিয়ে সিংহ বললো। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ তো সেটাই। জীবনে সুখশান্তি বলে কিছু নেই আমার সেজন্যে। কিন্তু মুশকিল কী জানো, বিপদ দেখলেই যে ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে থাকে!'

'হৃৎপিণ্ডের কোনো অসুখ আছে হয়তো তোমার,' টিনের কাঠুরে মন্তব্য করলো।

'তা থাকতে পারে,' বললো সিংহ।

'তা যদি হয়,' টিনের কাঠুরে বলে চললো, 'তোমার খুশি হওয়াই উচিত। কারণ এতে প্রমাণ হচ্ছে, হৃৎপিণ্ড আছে তোমার। আমার কথা ভাবো একবার—আমার হৃৎপিণ্ড নেই বলেই তো হৃৎপিণ্ডের রোগও হতে পারে না।'

'তা-ই হবে হয়তো,' চিন্তামগ্নভাবে বললো সিংহ, 'হৃৎপিণ্ড না থাকলে তো আর আমি কাপুরুষ হতে পারতাম না।'

'মগজ আছে তোমার?' কাকতাড়ুয়া জানতে চাইলো।

'আছে বোধ হয়,' সিংহ উত্তর দিলো, 'কখনো পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করিনি।'

'আমি মহাশক্তিমান ওজের কাছে যাচ্ছি খানিকটা মগজ চাইতে,' কাকতাড়ুয়া জানালো। 'আমার মাথা তো শুধু খড়ে ভর্তি।'

'আর আমি যাচ্ছি ওজের কাছে একটা হৃৎপিণ্ড চাইতে,' কাঠুরে বললো।

'আর আমি ওজের কাছে যাচ্ছি আমাকে আর টোটোকে ক্যানসাসে ফেরত পাঠাবার অনুরোধ জানাতে,' ডরোথি যোগ করলো।

'আচ্ছা, ওজ কি আমাকে খানিকটা সাহস দিতে পারবে বলে মনে

www.boiRboi.blogspot.com

হয়?' ভীরু সিংহ প্রশ্ন করলো।

'অবশ্যই,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো কাকতাড়ুয়া, 'যেমন অনায়াসে মগজ দিয়ে দিতে পারবে আমাকে।'

'কিংবা আমাকে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দিতে পারবে,' বললো টিনের কাঠুরে।

'কিংবা ক্যানসাসে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারবে আমাকে,' ডরোথি বললো।

'তাহলে, তোমরা যদি কিছু মনে না করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতে যাই,' সিংহ বললো। 'কারণ একটুও সাহস না থাকায় জীবন আমার এককথায় অসহ্য হয়ে উঠেছে।'

'বেশ তো, চলো—ভারী খুশি হবো আমরা তাহলে,' ডরোথি উত্তর দিলো। 'তুমি সঙ্গে থাকলে বনের অন্যান্য জীবজন্তু আমাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। তুমি যখন অতো সহজে ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারো, আমার মনে হয়, ওরা নিশ্চয় তোমার চেয়েও ভীরু।'

'সত্যি তা-ই,' সিংহ বললো, 'তবে তাতে তো আর আমার সাহস কিছু বাড়ছে না। আর যতদিন নিজেকে কাপুরুষ বলে জানছি, ততদিন আমার দুঃখও যাচ্ছে না।'

অবশেষে আবার যাত্রা শুরু হলো ছোট্ট দলটার। সিংহ বেশ রাজকীয় চালে ডরোথির পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। নতুন এই সঙ্গীকে টোটো প্রথমে খুব সুনজরে দেখেনি। কারণ, সে ভুলতে পারেনি, আরেকটু হলেই সিংহের প্রকাণ্ড চোয়ালের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিলো তার দেহ। তবে ধীরে ধীরে অনেকটা সহজ-স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তার আর ভীরু সিংহের মধ্যে

বেশ বন্ধুত্বও হয়ে গেছে।

এরপর সারাদিনে যাত্রায় আর কোনো বিঘ্ন ঘটলো না। অবশ্য টিনের কাঠুরে একবার একটা ছোট্ট পোকা মাড়িয়ে ফেললো। রাস্তা ধরে গুটিগুটি এগিয়ে যাচ্ছিলো খুদে পোকাটা, কাঠুরের ভারী দেহের চাপে একেবারে চ্যাপটা হয়ে গেল। খুবই মর্মাহত হলো টিনের কাঠুরে। কোনো জ্যান্ত প্রাণীর যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যে সবসময় খুব সাবধান থাকে সে, তবু এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। নীরবে হাঁটছিল সে, শোকে-দুঃখে চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে এলো। জলের ফোঁটাগুলো মুখের ওপর দিয়ে আস্তে করে গড়িয়ে নেমে চোয়ালের কবজার ভেতর ঢুকে পড়লো। ফলে মরচে ধরে গেল কবজাগুলোতে।

একটু পরে কী একটা প্রশ্ন করলো ডরোথি। জবাব দিতে গিয়ে টিনের কাঠুরে দেখলো, কিছুতেই মুখ খুলতে পারছে না—মরচে ধরে তার চোয়ালদু'টো একসঙ্গে সেঁটে গেছে শক্ত হয়ে। দারুণ ভয় পেয়ে গেল সে, ইশারা-ইঙ্গিতে অনেকভাবে ডরোথিকে তার দুর্দশার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ডরোথি কিছুই বুঝলো না। সিংহও বুঝতে পারছে না, ব্যাপারটা কী। কিন্তু কাকতাড়ুয়া তাড়াতাড়ি ডরোথির ঝুড়ি থেকে তেলের টিনটা বের করে কাঠুরের চোয়ালের জোড়দু'টোতে তেল লাগিয়ে দিলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই কথা ফুটলো কাঠুরের মুখে।

'খুব শিক্ষা হলো,' বলে উঠলো টিনের কাঠুরে, 'এবার থেকে দেখেশুনে পা ফেলতে হবে। আবার যদি কোনো পোকামাকড় পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলি, তাহলে আবার নিশ্চয় আমার কান্না পাবে। কাঁদলে মরচে ধরে যাবে চোয়ালে—কথা বলার উপায় থাকবে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

এরপর থেকে খুব সতর্কভাবে রাস্তার ওপর চোখ রেখে হাঁটতে লাগলো টিনের কাঠুরে। ছোট্ট একটা পিঁপড়ে দেখলেও সাবধানে ডিঙিয়ে যাচ্ছে যাতে সেটার কোনো ক্ষতি না হয়। হৃৎপিণ্ড নেই তার—সেজন্যেই খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয় যেন কোনকিছুর প্রতি ভুলেও সে কখনো নিষ্ঠুর বা নির্দয় আচরণ না করে।

'তোমাদের যাদের হৃৎপিণ্ড আছে, তাদের কোনো অসুবিধে নেই,' বললো সে। 'ভালোমন্দ বুঝতে পারো তোমরা, ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আমার তো হৃৎপিণ্ড নেই, সেজন্যে আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। ওজ যখন একটা হৃৎপিণ্ড দেবে, তখন আমারও আর অতো ভাবনা থাকবে না।'

সাত

আশপাশে কোনো ঘরবাড়ি না থাকায় বাধ্য হয়ে সে-রাতের জন্যে বনের একটা বড়ো গাছের নিচে আশ্রয় নিতে হলো ওদের। গাছের ঘন পাতার আচ্ছাদন মাথার ওপরে সুন্দর ছাউনি হিসেবে কাজ করায় সবাই শিশিরের হাত থেকে রক্ষা পেলো। টিনের কাঠুরে তার কুড়ুল দিয়ে মস্ত একগাদা কাঠ কেটে আনলো। সেই কাঠ দিয়ে চমৎকার একটা আগুনের কুণ্ড জ্বেলে ফেললো ডরোথি। শীত দূর হয়ে গেল তার, এখন আর তেমন নিঃসঙ্গও লাগছে না। সে এবং টোটো শেষ রুটিটুকু খেয়ে নিলো। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে কী খাবে তা ওর জানা নেই।

'যদি চাও, আমি বনের ভেতর গিয়ে তোমাদের জন্যে একটা হরিণ মেরে আনতে পারি,' বললো সিংহ। 'আগুনে ঝলসে নিতে পারবে মাংস—তোমাদের তো আবার অদ্ভুত রুচি, রান্না করা খাবারই তোমাদের পছন্দ। যাই হোক, হরিণের মাংস দিয়ে সকালে ভারী চমৎকার নাশতা হবে তোমাদের।'

'না না। অমন কাজ ক'রো না।' টিনের কাঠুরে আর্তনাদ করে উঠলো। 'অসহায় একটা হরিণকে মেরে আনো যদি, আমার ঠিক কান্না পেয়ে যাবে। আর তাহলে চোয়ালে মরচে ধরে যাবে আবার।'

www.boiRboi.blogspot.com

সিংহ আর কিছু না বলে বনের মধ্যে গিয়ে নিজের রাতের খাবার সেরে এলো। কী খেলো সে, কাউকে বললো না, ফলে কেউ জানতেও পেলো না।

কাছেই একটা গাছে প্রচুর বাদাম ফ'লে থাকতে দেখে কাকতাড়ুয়া ডরোথির ঝুড়ি নিয়ে বাদাম পাড়তে গেল। ঝুড়ি ভর্তি করে নিলো সে বাদামে, যাতে ডরোথির বেশ কয়েকদিন চলে যায়। কাকতাড়ুয়ার সহৃদয়তা আর বিবেচনাবোধ দেখে ডরোথি মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারলো না। তবে বেচারার বাদাম পাড়বার অদ্ভুত ভঙ্গি দেখে খুব একচোট হাসলো সে। কাকতাড়ুয়ার খড়ে ঠাসা হাতদু'টো এমনই বিদঘুটে, আর বাদামগুলো এতোই ছোট যে যতগুলো বাদাম ঝুড়িতে রাখে সে, প্রায় ততগুলোই মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু যতোই সময় লাগুক ঝুড়ি ভরতে, কাকতাড়ুয়ার তাতে কোনো খেদ নেই; বরং যতক্ষণ আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারছে, ততক্ষণই তার স্বস্তি। আগুনকে ভারী ভয় তার—একটা স্ফুলিঙ্গ যদি কোনরকমে গায়ের খড়ের ভেতর এসে পড়ে, দেখতে দেখতে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেজন্যে আগুনের শিখা থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখলো সবসময়। শেষ পর্যন্ত যখন ডরোথি ঘুমোবার জন্যে শুয়ে পড়লো, তখন সে কাছে এসে শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দিলো তাকে। পাতার রাশি বেশ উষ্ণ আরামদায়ক একটা আচ্ছাদন তৈরি করলো ডরোথিকে ঘিরে। নির্বিঘ্নে ঘুমোলো সে সারারাত।

দিনের আলো ফুটলে ডরোথি এক ঝিরঝিরে ঝরনার জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। একটু পরই সবাই মিলে আবার যাত্রা শুরু করলো পান্নানগরীর পথে।

বড়জোর ঘণ্টাখানেক হেঁটেছে ওরা, এমন সময় সামনে পড়লো

মস্ত একটা খাদ। হলদে ইটের রাস্তাকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করে গেছে সেটা—দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, বনভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। বেশ চওড়া-খাদটা। সাবধানে কিনারায় গিয়ে ওরা নিচে উঁকি দিয়ে দেখলো, গভীরতাও অনেক—তলদেশ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য বড়ো বড়ো এবড়োখেবড়ো পাথুরে শিখর। খাদের দু'পাড় এতো খাড়া যে, ওদের কারো পক্ষে নিচে নেমে যাওয়াও সম্ভব নয়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওদের যাত্রার বুঝি এখানেই ইতি।

'কী করবো আমরা এখন ?' ডরোথি হতাশ কণ্ঠে বলে উঠলো।

'কোনো উপায়ই দেখছি না,' বললো টিনের কাঠুরে।

সিংহ ঝাঁকড়া কেশর নাড়লো এদিক-ওদিক। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

কিন্তু কাকতাড়ুয়া বললো, 'উড়তে পারি না আমরা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মস্ত খাদের পাড় বেয়ে নিচে নেমে যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই, একমাত্র উপায়, খাদের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাওয়া। তা যদি না পারি, এখানেই যাত্রার শেষ আমাদের।'

'আমার মনে হয়, আমি লাফ দিয়ে খাদ পার হয়ে যেতে পারবো,' মনে মনে ভালোভাবে দূরত্ব মেপে ভীরু সিংহ বললো।

'তাহলে আর ভাবনা নেই আমাদের,' কাকতাড়ুয়া বলে উঠলো। 'এক এক করে পিঠে বসিয়ে তুমি আমাদের সবাইকে ওপারে নিয়ে যেতে পারবে।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি,' বললো সিংহ। 'প্রথমে কে যাবে ?'

'আমি,' ঘোষণা করলো কাকতাড়ুয়া। 'প্রথমে ডরোথিকে নিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

লাফ দিয়ে খাদ পার হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হও তুমি, ডরোথির প্রাণ যাবে। যদি টিনের কাঠুরেকে নিয়ে খাদে পড়ে যাও, নিচের পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে একদম বেঁকেচুরে যাবে সে। কিন্তু যদি আমি থাকি তোমার পিঠে, তেমন একটা বিপদের ভয় থাকবে না—কারণ, পড়ে গেলে কিছুই হবে না আমার।'

'পড়ে যেতে পারি ভেবে আমারও সাংঘাতিক ভয় লাগছে,' বললো ভীরু সিংহ। 'কিন্তু ওভাবে পার হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করারও তো দেখছি না। উঠে পড়ো আমার পিঠে, দেখি চেষ্টা করে।'

কাকতাড়ুয়া সিংহের পিঠে উঠে বসলো। প্রকাণ্ড জানোয়ারটা হেঁটে খাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো। পা গুটিয়ে গুড়ি মেরে বসলো তারপর।

'দূর থেকে দৌড়ে এসে লাফ দিচ্ছো না কেন ?' কাকতাড়ুয়া বললো।

'আমরা সিংহেরা ওভাবে লাফ দিই না,' উত্তর দিলো সিংহ। পায়ের ধাক্কায় অতর্কিতে প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়লো সে, খাদের ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে গিয়ে নিরাপদে অন্য পাড়ে গিয়ে নামলো।

সিংহ এতো সহজে কাজটা করতে পারলো দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলো সবাই। কাকতাড়ুয়া সিংহের পিঠ থেকে নেমে পড়তেই মস্ত জানোয়ারটা আবার লাফ দিয়ে খাদের এপারে চলে এলো।

এবার ডরোথি টোটোকে এক হাতে জাপটে ধরে উঠে বসলো সিংহের পিঠে। অন্য হাত দিয়ে শক্ত করে সিংহের কেশর চেপে ধরলো। পরমুহূর্তে তার মনে হলো, শূন্যের ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে

সে তীব্র গতিতে; ভালো করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেখলো, নিরাপদে পৌঁছে গেছে খাদের অন্য পাড়ে।

আবার ফিরে এসে টিনের কাঠুরেকে পার করে আনলো সিংহ। আবার সবাই জড়ো হলো এক জায়গায়।

সিংহকে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়ার সুযোগ দেবার জন্যে সবাই বসে পড়লো। পরপর অনেকগুলো প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে জানোয়ারটা হয়রান হয়ে পড়েছে। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সে, যেন প্রকাণ্ড একটা কুকুর অনেকক্ষণ দৌড়ুবার পর মাত্র এসে থেমেছে।

সিংহের বিশ্রাম নেয়া শেষ হলে সবাই আবার হলদে ইটের রাস্তা ধরে রওনা হলো। এপারের বন খুব ঘন। সবকিছু অস্পষ্ট, অন্ধকার মনে হচ্ছে চারপাশে। চুপচাপ হাঁটছে সবাই। প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবছে, এই অন্ধকার বন পেরিয়ে ওরা আদৌ কি আবার কখনো উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় পৌঁছুতে পারবে?

একটু পরেই বনের গহন থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করলো। অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল সবার। সিংহ ফিস্‌ফিস্ করে জানালো, বনের এদিকটাতেই ক্যালিডাদের বাস।

'ক্যালিডা কী?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'প্রকাণ্ড এক ধরনের জানোয়ার,' জবাব দিলো সিংহ, 'ভালুকের মতো দেহ ওদের, কিন্তু মাথা হচ্ছে বাঘের মতো। ওদের নখ এতো লম্বা আর ধারালো যে আমি যেমন অনায়াসে টোটোকে মেরে ফেলতে পারি, তেমনি অনায়াসে আমাকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলতে পারে একটা ক্যালিডা। আমি সাংঘাতিক ভয় পাই ওদের।'

'তাতে আর আশ্চর্য কী!' ডরোথি বললো, 'ভয়ঙ্কর জানোয়ার ওরা নিশ্চয়!'

www.boiRboi.blogspot.com

উত্তরে সিংহ কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। আবার একটা বাধার সামনে এসে পড়েছে ওরা হঠাৎ। রাস্তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে আরেকটা খাদ।

এক নজর তাকিয়েই সিংহ বুঝলো, এ-খাদ সে লাফ দিয়ে পার হতে পারবে না। অনেক বেশি চওড়া আর গভীর এটা।

কী করা যায় ভেবে দেখবার জন্যে সবাই বসে পড়লো। কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে কাকতাড়ুয়া বললো:

'একটা মস্তবড়ো গাছ আছে দেখো এদিকে খাদের একেবারে কিনারায়। টিনের কাঠুরে যদি গাছটা কেটে ওপাশে ফেলে দিতে পারে, ওটার ওপর দিয়ে হেঁটে অনায়াসে খাদ পার হয়ে যেতে পারবো আমরা।'

'চমৎকার বুদ্ধি!' বলে উঠলো সিংহ। 'কে বলবে শুধু খড় পোরা তোমার মাথায়—মগজ বলতে কিছু নেই?'

কাঠুরে তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেল। তার ধারালো কুড়ুলের ঘায়ে খুব অল্প সময়ের ভেতরই গাছের মোটা গুঁড়ির প্রায় সবটা কাটা হয়ে গেল। এবার সিংহ তার মজবুত দু'টো সামনের পা গাছের গায়ে ঠেকিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করলো। আস্তে কাত হয়ে গেল প্রকাণ্ড গাছটা, সশব্দে আছড়ে পড়লো খাদের ওপর আড়াআড়িভাবে। ওপরের ডালপালাগুলো গিয়ে পড়লো একেবারে ওপারে।

আজব সেতুটার ওপর দিয়ে দল বেঁধে রওনা হয়েছে ওরা, ঠিক এমন সময় বিকট হুঙ্কার শুনে সবাই চমকে পেছন ফিরে তাকালো। আতঙ্কিত চোখে চেয়ে দেখলো, দু'টো বিশালকায় জানোয়ার দূর থেকে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ভালুকের মতো দেহ জানোয়ার-

দু'টোর, অথচ মাথাগুলো বাঘের মতো।

'ওরাই ক্যালিডা!' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলো সিংহ।

'জলদি!' কাকতাড়ুয়া তাড়া দিলো, 'তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাই আমরা, চলো!'

সবার আগে টোটোকে কোলে নিয়ে ছুটলো ডরোথি, তার পেছনে টিনের কাঠুরে, তারপর কাকতাড়ুয়া। সিংহ যদিও খুব ভয় পেয়ে গেছে, তবু ক্যালিডাদের মোকাবেলা করার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো। সাংঘাতিক জোরালো আর ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার ছাড়লো সে। শুনে ডরোথি পর্যন্ত আর্তনাদ করে উঠলো ভয়ে, আর কাকতাড়ুয়া সটান চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ওদিকে ভয়াল জানোয়ারদু'টোও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সিংহের ভীষণ গর্জন শুনে, আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে।

কিন্তু যখন ক্যালিডাদু'টো দেখলো, আকারে সিংহ অনেক ছোট ওদের চেয়ে, এবং ওদের দু'জনের বিরুদ্ধে সিংহ একা, তখন আবার সামনে ধেয়ে এলো তারা। সিংহ আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে ছুট দিলো গাছের ওপর দিয়ে। দলের অন্য সবাই এর মধ্যে ওপারে পৌঁছে গেছে।

খাদ পেরিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকালো সিংহ। দেখলো, এক মুহূর্তের জন্যেও না থেমে ভয়ঙ্কর জানোয়ারদু'টোও গাছের ওপর দিয়ে খাদ পেরোতে শুরু করেছে।

'আর রক্ষা নেই আমাদের!' সিংহ বলে উঠলো ডরোথির উদ্দেশে, 'ধারালো নখর দিয়ে ওরা আমাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তবু আমার পেছনে গিয়ে দাঁড়াও তোমরা—যতক্ষণ প্রাণ আছে আমি লড়াই করবো ওদের সঙ্গে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'দাঁড়াও!' কাকতাড়ুয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। কী করলে ভালো হয় ভাবছিল সে এতক্ষণ। এবার কাঠুরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'গাছের মাথার যেটুকু খাদের এদিকের কিনারায় আটকে আছে, সেটুকু কেটে বাদ দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি!'

টিনের কাঠুরে সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুল চালালো। ক্যালিডাদু'টো যখন প্রায় খাদ পেরিয়ে চলে এসেছে, হঠাৎ মড়মড় করে প্রচণ্ড শব্দে গাছের সেতু ধসে পড়লো নিচে। হিংস্র কুৎসিত দানবদু'টোও সেই-সঙ্গে নেমে গেল খাদের গভীরে—ধারালো শিলার ওপর আছড়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

'বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছি!' স্বস্তির একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলো ভীরু সিংহ, 'আয়ু আরেকটু বাড়লো বোধ হয় আমাদের। ভারী খুশি লাগছে সত্যি—মরে যাওয়াটা নিশ্চয় আদৌ মজার কোনো ব্যাপার নয়। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ওই জানোয়ার-গুলো! এখনও লাফাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডটা।'

'ইস্,' টিনের কাঠুরে বলে উঠলো বিষণ্ণ গলায়, 'লাফানোর মতো একটা হৃৎপিণ্ড আমারও থাকতো যদি!'

এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর সবাই বন ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোবার জন্যে আরো অধীর হয়ে উঠলো। এতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো ওরা যে ডরোথি কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। বাধ্য হয়ে সিংহের পিঠে উঠে বসতে হলো তাকে। আরো কিছুদূর এগোবার পর গাছপালার ঘনত্ব কমে আসতে শুরু করলো। খুব খুশি হয়ে উঠলো সবাই।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর ওরা হঠাৎ একটা চওড়া নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলো। ওদের ঠিক সামনেই বিপুল বেগে বয়ে চলেছে নদীটা।

এপাশে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, নদীর অন্য পাড় থেকে হলদে ইটের রাস্তা আবার সামনে এগিয়ে গেছে সুন্দর এক রাজ্যের ভেতর দিয়ে। ঘাসে ঢাকা সবুজ প্রান্তর বিছিয়ে আছে পথের দু'ধারে। তার মাঝে এখানে-ওখানে উজ্জ্বল বর্ণের অজস্র ফুল ফুটে আছে। রাস্তার দু'-পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নানারকম সুস্বাদু ফলের গাছ। অঢেল ফল ঝুলছে সেগুলোর ডালে। অপরূপ সুন্দর এই রাজ্যের শোভা দেখে ওদের মন আনন্দে নেচে উঠলো।

'নদী পার হবো কী করে আমরা?' ডরোথি বললো।

'খুব সহজেই পার হওয়া যাবে,' জবাব দিলো কাকতাড়ুয়া। 'টিনের কাঠুরে ভেলা বানিয়ে ফেলবে একটা, তাতে চড়ে আমরা অনায়াসে নদীর ওপারে গিয়ে উঠতে পারবো।'

দেরি না করে কাঠুরে ভেলা তৈরির জন্যে কুড়ুল দিয়ে ছোট ছোট গাছ কাটতে শুরু করলো। এদিকে কাকতাড়ুয়া একটু খোঁজাখুঁজি করতেই নদীর তীরে চমৎকার ফলে ভর্তি একটা গাছ পেয়ে গেল। খুশি হয়ে উঠলো ডরোথি, সারাদিন সে বাদাম ছাড়া আর কিছু খায়নি। এবার পেট পুরে পাকা ফল খেয়ে নিলো।

কিন্তু ভেলা তৈরি করা সহজ কথা নয়। টিনের কাঠুরের মতো অক্লান্ত পরিশ্রমী লোকেরও সেজন্যে অনেক সময় দরকার। কাজ শেষ হওয়ার আগেই অন্ধকার নেমে এলো। কাজেই গাছের নিচে ভালো একটা জায়গা খুঁজে নিলো ওরা রাত কাটাবার জন্যে।

সকাল পর্যন্ত নিরুপদ্রবে ঘুমোলো ডরোথি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পান্না-নগরী আর মহাশক্তিমান ওজের জাদুকরকে দেখতে পেলো স্বপ্নের ভেতর।

www.boiRboi.blogspot.com

আট

পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর আর নতুন আশা-উদ্দীপনা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো দলের সবাই। ডরোথি নদীতীরের বিভিন্ন গাছের সুস্বাদু ফলমূল দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে নাশ্‌তা সারলো। পেছনে অন্ধকার অরণ্য। অনেক বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ওই বন ওরা নিরাপদে পার হয়ে এসেছে। তবে সামনে দেখা যাচ্ছে এক আলোকোজ্জ্বল মনোরম রাজ্য। পান্নানগরীর পথে ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন ওই দেশ।

ওই অপরূপ রাজ্যে পৌঁছুবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনের চওড়া নদী। তবে ভেলা তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। টিনের কাঠুরে আরো কয়েকটা গাছ কেটে সেগুলো কাঠের গজাল দিয়ে একসঙ্গে জুড়ে নিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল ওরা।

ডরোথি টোটোকে কোলে নিয়ে ভেলার ঠিক মাঝখানে বসলো। ভীরু সিংহ ভেলায় পা দিতেই সেটা অনেকখানি কাত হয়ে পড়লো একপাশে, কারণ তার প্রকাণ্ড দেহের ওজন অনেক। কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরে তাড়াতাড়ি ভেলার অন্য মাথায় সরে দাঁড়ালো। ভারসাম্য মোটামুটি ফিরে এলো আবার। লম্বা লগি দিয়ে তারা

দু'জন পানির ভেতর দিয়ে ভেলা চালিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলো।

প্রথম দিকে বেশ সহজেই এগোতে পারলো ওরা। কিন্তু নদীর মাঝ বরাবর পৌঁছুতেই নদীর তীব্র স্রোত ভাটির দিকে ঠেলে নিয়ে চললো ভেলা। হলদে ইটের রাস্তা থেকে ওরা ক্রমেই দূরে, আরো দূরে সরে যেতে থাকলো। পানির গভীরতাও বেড়ে গেল সেইসঙ্গে, লম্বা লগি আর নদীর তলা পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে না।

'মুশকিল হলো দেখছি,' বললো টিনের কাঠুরে, 'তাড়াতাড়ি তীরে পৌঁছুতে না পারলে তো স্রোত আমাদের পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনীর রাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ডাইনী তখন জাদু করে দাস বানিয়ে রাখবে সবাইকে।'

'আর তাহলে মগজ পাওয়া হবে না আমার,' কাকতাড়ুয়া বললো।

'আমার সাহস পাওয়া হবে না,' বললো ভীরু সিংহ।

'আমি হৃৎপিণ্ড পাবো না,' টিনের কাঠুরে বললো।

'আর আমি কোনদিন ফিরে যেতে পারবো না ক্যানসাসে,' বললো ডরোথি।

'পান্নানগরীতে পৌঁছুতেই হবে আমাদের, যে-করেই হোক,' ব'লে কাকতাড়ুয়া তার হাতের লম্বা লগি পানিতে ফেলে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিলো। অমনি নদীর তলার কাদার ভেতর সেটার ডগা আটকে গেল শক্ত হয়ে। লগিটা চট্ করে টেনে তুলতে পারলো না সে, ছেড়ে দেয়ারও সময় পেলো না—পায়ের নিচ থেকে চোখের পলকে ভেলাটা ভেসে চলে গেল স্রোতের টানে। বেচারা কাকতাড়ুয়া খরস্রোতা নদীর মাঝখানে লগির মাথায় অসহায়ভাবে লটকে রইলো।

'বিদায়!' সঙ্গীদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠলো সে।

www.boiRboi.blogspot.com

কাকতাড়ুয়াকে হারিয়ে সবার মন বিষাদে ভরে গেল। টিনের কাঠুরে তো মনের দুঃখে কেঁদেই ফেললো। ভাগ্যিস সময় থাকতে মনে পড়ে গেল তার, কাঁদলে চোখের জল লেগে চোয়ালের কবজায় মরচে ধরে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি কান্না থামিয়ে ডরোথির কাপড়ের কোণ দিয়ে চোখ মুছে নিলো সে।

কাকতাড়ুয়ার অবস্থা সত্যি শোচনীয়।

'ডরোথির সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় আমার, তখনকার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়লাম দেখছি,' ভাবছে সে মনে মনে। 'তখন আমি খুঁটির মাথায় লটকানো ছিলাম ফসলের খেতের ভেতর—কাক তাড়ানোর ভান অন্তত করতে পারতাম সেখানে। কিন্তু নদীর মাঝখানে লগির মাথায় আটকে থেকে কী করার আছে একটা কাকতাড়ুয়ার? আর, মগজ? সে হয়তো আর কোনদিনই পাওয়া হলো না আমার।'

ওদিকে ভেলা ভেসে চলেছে নদীর স্রোতের সঙ্গে। বেচারা কাকতাড়ুয়াকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। অবশেষে সিংহ বললো :

'বাঁচতে হলে কিছু একটা তো করা দরকার। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তোমরা যদি আমার লেজের ডগা শক্ত করে ধরে থাকো, আমি বোধ হয় ভেলা টেনে নিয়ে সাঁতরে তীরে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো।'

পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সিংহ, টিনের কাঠুরে তার লেজের ডগা শক্ত করে চেপে ধরে রইলো। এবার সর্বশক্তি দিয়ে সিংহ তীরের দিকে সাঁতরে চললো। আকারে সে প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু কাজটা কঠিন পরিশ্রমের। তবু বিন্দু বিন্দু করে ভেলাটাকে টেনে নদীর মাঝ-

খানের তীব্র স্রোতের বাইরে নিয়ে গেল সে। পানির গভীরতা কমে আসতেই ডরোথি টিনের কাঠুরের লম্বা লগিটা হাতে তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ঠেলে ভেলাটাকে তীরের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে লাগলো।

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় শেষ পর্যন্ত তীরের নাগাল পেলো ওরা। একে একে ভেলা থেকে নেমে সুন্দর সবুজ ঘাসে পা রাখলো। ওরা জানে, স্রোতের টানে হলদে ইটের রাস্তা ছেড়ে বহুদূরে চলে এসেছে।

রোদে গা শুকিয়ে নেয়ার জন্যে সিংহ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো।

'এখন কী করবো আমরা?' জানতে চাইলো টিনের কাঠুরে।

'যে-করেই হোক হলদে ইটের রাস্তায় গিয়ে উঠতে হবে আবার,' বললো ডরোথি।

'সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, নদীর তীর ধরে উল্টোদিকে হাঁটা দেয়া,' সিংহ মন্তব্য করলো, 'তাহলে একসময় আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো হলদে ইটের রাস্তায়।'

কাজেই বিশ্রাম শেষ হলে ডরোথি তার ঝুড়ি তুলে নিলো হাতে, ঘাসে ঢাকা নদীতীর ধরে তিনজন রওনা হলো হলদে ইটের রাস্তার উদ্দেশে। এ এক অপরূপ সুন্দর দেশ। চারদিকে অজস্র ফুল, অসংখ্য ফলের গাছ আর অকৃপণ সূর্যের আলো। দুর্ভাগা কাকতাড়ুয়ার জন্যে মন খারাপ না থাকলে সত্যি খুব ভালো লাগতো ওদের।

যতো দ্রুত সম্ভব হেঁটে চলেছে তিনজন। ডরোথি শুধু একবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামলো—সুন্দর একটা ফুল তোলার জন্যে।

বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ টিনের কাঠুরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই দেখো!'

www.boiRboi.blogspot.com

সবাই ফিরে তাকালো নদীর দিকে। পানির মাঝখানে লগির মাথায় লটকে থাকা অসহায় কাকতাড়ুয়াকে দেখতে পেলো। ভারী নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে।

'কী করে উদ্ধার করা যায় ওকে, বলো তো?' ডরোথি জানতে চাইলো।

সিংহ এবং টিনের কাঠুরে দু'জনই এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো। কোনো বুদ্ধি আসছে না তাদের মাথায়।

নদীর পাড়ে বসে পড়লো তিনজন। করুণ চোখে চেয়ে রইলো কাকতাড়ুয়ার দিকে।

ঠিক এমন সময় পাশ দিয়ে একটা সারস উড়ে যাচ্ছিলো। নদীর তীরে ওদের তিনজনকে বসে থাকতে দেখে নেমে এলো সে, পানির কিনারায় বসলো।

'তোমরা কারা?' জিজ্ঞেস করলো সারস, 'এখানে কী করছো?'

'আমার নাম ডরোথি,' ডরোথি জবাব দিলো। 'এরা আমার বন্ধু—টিনের কাঠুরে আর ভীরু সিংহ। পান্নানগরীতে যাচ্ছি আমরা।'

'সে-রাস্তা তো এদিকে নয়,' বললো সারস। লম্বা গলা বাঁকিয়ে আজব দলটাকে তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো সে।

'জানি,' ডরোথি বললো। 'আমাদের দল থেকে কাকতাড়ুয়া বাদ পড়ে গেছে, তাকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় তা-ই ভাবছি।'

'কোথায় সে?' সারস জানতে চাইলো।

'ওই যে নদীর মধ্যে,' বললো ডরোথি।

'ও যদি অতো বড়ো আর ভারী না হতো তাহলে আমি ওকে ওখান থেকে তুলে তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারতাম,' মন্তব্য করলো সারস।

'মোটেই ভারী নয় কাকতাড়ুয়া,' ডরোথি সাগ্রহে বলে উঠলো, 'দেখতে অতো বড়ো হলে কী হবে, ওর শরীর তো খড়ে ভর্তি। যদি তুমি ওকে এনে দাও, আমরা তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখা যাক,' বললো সারস। 'তবে যদি দেখি, ও এতো ভারী যে আমার বইবার সাধ্য নেই, তাহলে কিন্তু ওকে আবার নদীর ভেতরই ফেলে রেখে আসতে হবে আমাকে।'

প্রকাণ্ড পাখিটা আবার উঠে পড়লো আকাশে, পানির ওপর দিয়ে উড়ে কাকতাড়ুয়ার কাছে গিয়ে হাজির হলো। তারপর বড়ো বড়ো নখর দিয়ে তার বাহু খামচে ধরে লগির মাথা থেকে ওপরে তুলে নিলো। হালকা দেহটা শূন্যের ভেতর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এসে নদীর তীরে ডরোথি, সিংহ, টিনের কাঠুরে আর টোটোর কাছে নামিয়ে দিলো।

বন্ধুদের মধ্যে আবার ফিরে আসতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল কাকতাড়ুয়া। সবার সঙ্গে আলিঙ্গন করলো সে—এমনকি সিংহ এবং টোটোর সঙ্গেও। সবাই আবার হাঁটতে শুরু করলো। খুশির চোটে কাকতাড়ুয়া প্রত্যেকবার পা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে উঠছে অদ্ভুত সুরে।

'আমি তো ভেবেছিলাম, চিরকাল ওভাবে নদীর ভেতরই কাটিয়ে দিতে হবে,' বললো সে, 'শুধু সারসের দয়ায় উদ্ধার পেয়েছি এ-যাত্রা। সত্যি যদি কোনদিন মগজ পাই, সারসকে খুঁজে বের করবো আমি—তার এই দয়ার প্রতিদান দেবো।'

'ও কিছু নয়,' পাশাপাশি উড়ে ওদের সঙ্গে যেতে যেতে বললো সারস। 'কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হই। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে, বাসায় ছানারা অপেক্ষা

www.boiRboi.blogspot.com

করছে। আশা করি পান্নানগরীতে পৌঁছুতে পারবে তোমরা—ওজ তোমাদের ইচ্ছে পূরণ করবে।'

'ধন্যবাদ,' ডরোথি বললো।

ডানা ঝাপটে ওপরে উঠে গেল সারস। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

রঙ-বেরঙের পাখির গান শুনতে শুনতে আর ফুলের অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে ডরোথি আর তার বন্ধুরা এগিয়ে চললো। এতো অসংখ্য ফুল এখন চারপাশে যে মনে হচ্ছে, ফুলের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে কেউ মাটির বুকে। বড়ো বড়ো হলুদ শাদা নীল আর বেগুনি ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। তাছাড়া রয়েছে টকটকে লাল রঙের রাশি রাশি পপি ফুলের বিশাল সব বন—সেগুলোর রঙ এতো উজ্জ্বল যে ডরোথির চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে গেল।

'ভারী সুন্দর ওই ফুলগুলো, তাই না?' নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুলের মদির সুবাস নাকে টেনে নিতে নিতে বললো সে।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কাকতাড়ুয়া উত্তর দিলো। 'যখন মগজ হবে আমার, হয়তো আরো ভালো লাগবে এসব ফুল।'

'যদি শুধু একটা হৃৎপিণ্ড থাকতো আমার, ফুলগুলোকে আমি ভালোবাসতে পারতাম,' টিনের কাঠুরে যোগ করলো।

'ফুল আমার সবসময়ই ভালো লাগে,' বললো সিংহ। 'ভারী অসহায় আর নরম ওরা। তবে এতো উজ্জ্বল সুন্দর ফুল বনে কখনো দেখিনি।'

যতোই এগোচ্ছে ওরা, বড়ো বড়ো লাল পপি ফুলের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, এবং সেইসঙ্গে কমে আসছে অন্যান্য ফুলের সংখ্যা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পপি ফুলে ছাওয়া বিশাল এক প্রান্তরের

মধ্যে এসে পড়লো। সবাই জানে, যদি কোথাও একসঙ্গে অসংখ্য পপি ফুল ফুটে থাকে, তাহলে গন্ধে এতো ভারী হয়ে ওঠে সেখানকার বাতাস যে সেই বাতাসে কেউ শ্বাস নিলে সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে। ফুলের গন্ধের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া না হলে তার সেই ঘুম আর কখনো ভাঙে না। কিন্তু ডরোথির জানা নেই কথাটা। তাছাড়া অগুনতি উজ্জ্বল লাল ফুলের এই বিস্তীর্ণ বন সে চট্ করে পেরিয়ে যেতেও পারছে না। কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো তার। ভালো করে হাঁটতে পারছে না, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসে পড়তে ইচ্ছে করছে, ঢলে পড়ছে ঘুমে।

কিন্তু টিনের কাঠুরে তাকে থামতে দিচ্ছে না।

'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের,' বলছে কাঠুরে, 'অন্ধকার নামার আগেই হলদে ইটের রাস্তায় গিয়ে উঠতে হবে।'

তার কথায় কাকতাড়ুয়াও সায় দিলো। হাঁটা না থামিয়ে এগিয়ে চললো ওরা।

কিন্তু একসময় নিজের অজান্তেই ডরোথির দু'চোখ বুজে এলো। কোথায় রয়েছে ভুলে গেল সে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়লো পপি ফুলের অরণ্যে।

'কী করবো এখন আমরা?' টিনের কাঠুরে জানতে চাইলো।

'এখানে ফেলে গেলে ও মারা যাবে,' সিংহ বললো। 'ফুলের গন্ধ আমাদের সবাইকে কাবু করে ফেলছে। আমিও আর কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছি না। কুকুরটা তো ঘুমিয়েই পড়েছে।'

কথাটা সত্যি। টোটোও লুটিয়ে পড়েছে ডরোথির পাশে। কিন্তু কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরে রক্তমাংসের তৈরী নয় বলে ফুলের গন্ধ তাদের ওপর কোনো ক্রিয়া করতে পারছে না।

www.boiRboi.blogspot.com

'ছুটতে শুরু করো জলদি!' কাকতাড়ুয়া বললো সিংহকে, 'যতো তাড়াতাড়ি পারো এই মারাত্মক ফুলের রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে যাও। ডরোথিকে আমরা নিয়ে আসছি, কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়লে তোমার অতো বড়ো দেহ আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারবো না।'

গা ঝাড়া দিয়ে টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালো সিংহ, তারপর প্রাণপণ বেগে ছুটে চললো সামনে। মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

'হাত ধরাধরি করে একটা চেয়ারের মতো তৈরি করি এসো আমরা—তার ওপর বসিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে,' কাকতাড়ুয়া প্রস্তাব দিলো।

টোটোকে তুলে নিয়ে ডরোথির কোলে শুইয়ে দিলো ওরা। তারপর কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরে একসঙ্গে দু'জনের হাত জুড়ে একটা চেয়ারের মতো তৈরি করলো। দু'জনের মাঝখানে সেই চেয়ারের ওপর ঘুমন্ত ডরোথিকে বসিয়ে বয়ে নিয়ে চললো ফুলে ছাওয়া প্রান্তরের ভেতর দিয়ে।

দু'জন হাঁটছে তো হাঁটছেই। মনে হচ্ছে, চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা এই মারাত্মক ফুলের বিশাল গালিচা বুঝি কখনো শেষ হবে না। নদীর বাঁক ঘুরে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো ওরা।

পপি ফুলের শয্যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে ওদের বন্ধু ভীরু সিংহ। ফুলের উগ্র গন্ধের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছে প্রকাণ্ড জানোয়ারটা, ফুলের রাজ্য আর সামান্যমাত্র বাকি থাকতে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। ওদের সামনে ফুলের বনের সীমানা ছুঁয়ে বিছিয়ে রয়েছে নরম ঘাসে ঢাকা সুন্দর সবুজ মাঠ।

'ওর জন্যে আর কিছুই করার নেই আমাদের,' টিনের কাঠুরে বললো বিষণ্ণ গলায়। 'খুব বেশি ভারী ও, আমাদের পক্ষে টেনে তুলে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চিরনিদ্রার কোলে ওকে এখানে ফেলে রেখে আমাদের চলে যেতে হবে। হয়তো ঘুমের ঘোরেই স্বপ্ন দেখবে ও, শেষ পর্যন্ত সাহস খুঁজে পেয়েছে।'

'আমারও খুব দুঃখ হচ্ছে ওর জন্যে,' কাকতাড়ুয়া বললো। 'অতো ভীরু হলে কী হবে, বন্ধু হিসেবে সত্যি ওর তুলনা হয় না। যাক্, চলো এগোই।'

পপি ফুলের বন ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরে এসে ওরা ঘুমন্ত ডরোথিকে নদীর ধারের একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে এলো। আস্তে করে শুইয়ে দিলো নরম ঘাসের ওপর। ফুলের বিবশ-করা গন্ধ এতদূর ভেসে আসতে পারবে না। ঠাণ্ডা নির্মল হাওয়া ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়ে আনবে ওর।

www.boiRboi.blogspot.com

নয়

'হলদে ইটের রাস্তা থেকে আমরা নিশ্চয় আর খুব বেশি দূরে নেই,' ডরোথির পাশে অপেক্ষমাণ কাকতাড়ুয়া মন্তব্য করলো, 'কারণ নদীর স্রোতে যতদূর ভেসে গিয়েছিলাম আমরা, প্রায় ততদূরই আবার ফিরে এসেছি।'

উত্তর দেবার জন্যে মাত্র মুখ খুলেছিল টিনের কাঠুরে, হঠাৎ একটা চাপা গর্জন শুনে থমকে গেল। চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেলো, অদ্ভুত একটা জন্তু ঘাসের ওপর দিয়ে তীরবেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে। আসলে জন্তুটা একটা প্রকাণ্ড হলদে বনবেড়াল। কাঠুরের মনে হলো, কোনকিছুকে তাড়া করে আসছে জন্তুটা; কারণ সেটার কানদু'টো সেঁটে আছে মাথার সঙ্গে, হাঁ করা মুখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দু'সারি কুৎসিত দাঁত, লাল চোখদু'টো আগুনের গোলার মতো জ্বলছে।

জন্তুটা আরো কাছে আসতেই টিনের কাঠুরে দেখতে পেলো, সেটার সামনে সামনে দৌড়ে আসছে ছোট্ট একটা ধূসর মেঠো ইঁদুর। হৃৎপিণ্ড না থাকলেও কাঠুরের বুঝতে অসুবিধে হলো না, এমন একটা সুন্দর নিরীহ জীবকে খুন করার চেষ্টা করা মোটেই উচিত নয়। বনবেড়ালের এ খুব অন্যায় হচ্ছে।

কুড়ুল তুললো কাঠুরে। বনবেড়ালটা তার পাশ দিয়ে দৌড়ে যাবার মুহূর্তে দ্রুত এক কোপ মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সেটার মাথা ধড় থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গেল। দু'টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়লো জন্তুটা কাঠুরের পায়ের কাছে।

শত্রুর কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মেঠো ইঁদুর থেমে দাঁড়ালো। গুটিগুটি পায়ে কাঠুরের কাছে এগিয়ে এসে মিহি গলায় চিঁ-চিঁ করে বললো:

'ধন্যবাদ তোমাকে! আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।'

'দয়া করে ওসব ব'লো না,' কাঠুরে জবাব দিলো। 'আমার হৃৎপিণ্ড নেই, সেজন্যে অসহায় যারা তাদের সাহায্য করার কথাটা সবসময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হয় আমাকে—সে যদি সামান্য একটা ইঁদুর হয়, তবু।'

'সামান্য ইঁদুর!' সরোষে ফুঁসে উঠলো খুদে প্রাণীটা। 'জানো, আমি কে? আমি একজন রানী—সমস্ত মেঠো ইঁদুরের রানী আমি।'

'তাই নাকি!' বলে কাঠুরে তাড়াতাড়ি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো।

'হ্যাঁ,' বললো রানী, 'তাহলে দেখো, আমার প্রাণ বাঁচিয়ে কত-বড়ো একটা কাজ করেছো তুমি, কতোটা সাহসের পরিচয় দিয়েছো!'

এমন সময় দেখা গেল, কতকগুলো ইঁদুর ছোট ছোট পায়ে যতো দ্রুত সম্ভব ছুটে আসছে। রানীকে দেখে তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো:

'মহারানী, আপনি বেঁচে আছেন! আমরা তো ভেবেছি, আপনাকে মেরেই ফেলেছে! ওই ভয়ঙ্কর বনবেড়ালের হাত থেকে রেহাই

www.boiRboi.blogspot.com

পেলেন কী করে?' বলতে বলতে তারা এমনভাবে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলো খুদে রানীকে যে মনে হতে লাগলো, সবাই মাথার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'এই অদ্ভুত টিনের মানুষটা বনবেড়ালকে মেরে আমার জীবন রক্ষা করেছে,' রানী উত্তর দিলো। 'কাজেই এর পর থেকে তোমরা সবাই মান্য করবে তাকে—তার সামান্যতম আজ্ঞাও পালন করবে নির্দ্বিধায়।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একযোগে চেঁচিয়ে উঠলো সমস্ত ইঁদুর।

ঠিক এই সময় টোটো ঘুম থেকে জেগে উঠলো। ক্যানসাসে থাকতে ইঁদুরের পিছু ধাওয়া করতে সবসময় খুব ভালো লাগতো তার, এর ভেতর খারাপ কিছু সে কখনো দেখেনি। হঠাৎ চারপাশে এতো ইঁদুর দেখে দারুণ মজা পেয়ে 'ঘেউ' ক'রে ডেকে উঠে সোজা ইঁদুরের পালের ভেতর লাফিয়ে পড়লো সে। অমনি ইঁদুরের দল ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারলো ছুড়দাড় করে ছুটে পালালো।

টিনের কাঠুরে তাড়াতাড়ি টোটোকে ধরে ফেলে হাতে তুলে নিলো। দু'হাতে শক্ত করে তাকে ধরে রেখে ইঁদুরদের ডাকতে লাগলো: 'ফিরে এসো! ফিরে এসো তোমরা! ভয় নেই, টোটো তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'

আশ্বাস পেয়ে ইঁদুররানী ঘাসের একটা গোছার নিচ থেকে মাথা বের করে ভীরু গলায় জানতে চাইলো, 'সত্যি বলছো তো, ও আমাদের কামড়াবে না?'

'আমি কামড়াতে দেবো না,' কাঠুরে বললো, 'কাজেই ভয়ের কিছু নেই।'

গুটিগুটি পায়ে এক এক করে আর সব ইঁদুরও ফিরে এলো। টোটো আর ঘেউঘেউ করলো না, তবে হাতপা ছুঁড়ে কাঠুরের হাত থেকে ছাড়া পেতে চেষ্টা করলো যথেষ্ট। খুব ভালো করেই জানে সে, কাঠুরে টিনের তৈরি, নয়তো তাকে সে ঠিক কামড়ে দিতো।

শেষ পর্যন্ত বড়ো একটা ইঁদুর কাঠুরের সামনে এসে দাঁড়ালো। 'আমাদের রানীর জীবন রক্ষা করেছো তুমি,' বললো সে, 'তার প্রতিদানে আমরা তোমার কোনো উপকার করতে পারি ?'

'সেরকম কিছু তো আমি দেখছি না,' কাঠুরে জবাব দিলো।

কাকতাড়ুয়া এতক্ষণ ধরে কী যেন একটা মনে করতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু মাথায় খড় পোরা বলে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলো না কী সেটা। এবার চট্ করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারো! আমাদের বন্ধু ভীরু সিংহের প্রাণ বাঁচাতে পারো তোমরা। পপি ফুলের বনে ঘুমিয়ে আছে সে।'

'সিংহ!' খুদে ইঁদুররানী আর্তনাদ করে উঠলো। 'সে তো আমাদের সবাইকে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে!'

'না না, কাকতাড়ুয়া অভয় দিলো, 'আমি যে-সিংহের কথা বলছি সে একদম ভীরু।'

'তাই নাকি!' বললো ইঁদুর।

'নিজেই তো তাই বলে সে,' কাকতাড়ুয়া জানালো, 'তাছাড়া আমাদের কোনো বন্ধুর ক্ষতি সে কখনো করবে না। তাকে উদ্ধার করতে তোমরা যদি আমাদের সাহায্য করো, অবশ্যই তোমাদের সবার সাথে সে খুব ভালো ব্যবহার করবে।'

'বেশ,' রানী বললো, 'আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করছি। কিন্তু কী করতে হবে আমাদের ?'

'তোমাকে রানী বলে মানে, তোমার আদেশ পালন করে, এরকম ইঁদুরের সংখ্যা কি অনেক হবে ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, হাজার হাজার ইঁদুর আমাকে রানী বলে মান্য করে,' রানী জবাব দিলো।

'তাহলে তাদের সবাইকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে চলে আসতে খবর পাঠাও। আর বলে দাও, সবাই যেন লম্বা এক টুকরো করে রশি সঙ্গে নিয়ে আসে।'

রানী তার সঙ্গী ইঁদুরদের দিকে ফিরলো। তৎক্ষণাৎ গিয়ে তার সমস্ত প্রজাকে এনে হাজির করতে নির্দেশ দিলো তাদের। রানীর আদেশ শোনামাত্র ইঁদুরের পাল দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এবার,' টিনের কাঠুরের দিকে চেয়ে বললো কাকতাড়ুয়া, 'নদীর ধারের ওই গাছগুলোর কাছে চলে যাও তুমি। গাছ কেটে সিংহকে বয়ে নিয়ে আসার মতো একটা চাকাওয়ালা গাড়ি তৈরি করে ফেলো।'

সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে চলে গেল কাঠুরে, কাজ শুরু করে দিলো। কয়েকটা গাছ কেটে সমস্ত পাতা আর ডালপালা ছেঁটে ফেললো। তারপর কাঠের গজাল দিয়ে সেগুলো একসঙ্গে জুড়ে বড়ো একটা পাটাতন তৈরি করলো। মোটাসোটা একটা গাছের গুঁড়ি থেকে আড়াআড়ি চারটে খাটো টুকরো কেটে নিয়ে তৈরি করলো গাড়ির চারখানা চাকা। এতো তাড়াতাড়ি আর এতো নিপুণভাবে কাজ সারলো সে যে ইঁদুরের দল যখন এসে পৌঁছুতে শুরু করলো ততক্ষণে গাড়ি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে।

চারদিক থেকে আসতে থাকলো ইঁদুরের পাল। হাজার হাজার

www.boiRboi.blogspot.com

ইঁদুর : বড়ো ইঁদুর, ছোট ইঁদুর, মাঝারি ইঁদুর—সবার মুখে এক-টুকরো করে রশি।

ঠিক এরকম সময়ে দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠলো ডরোথি। চোখ মেলে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল। ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে সে, হাজার হাজার ইঁদুর চারদিকে দাঁড়িয়ে তার দিকে ভীরু চোখে চেয়ে আছে।

কাকতাড়ুয়া সব কথা খুলে বললো ডরোথিকে, তারপর ভারিক্কি চালের ছোট্ট ইঁদুরটার দিকে ফিরে বললো :

'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন মহামান্যা রানী।'

ডরোথি সসম্মানে মাথা নুইয়ে রানীকে অভিবাদন জানালো। প্রত্যুত্তরে রানীও ঝুঁকে সম্মান দেখালো তাকে। এরপরই দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল।

কাকতাড়ুয়া এবং কাঠুরে এবার ইঁদুরদের নিয়ে আসা রশির টুকরো দিয়ে গাড়ির সঙ্গে তাদের জুততে শুরু করলো। সমস্ত রশির একপ্রান্ত গাড়ির সঙ্গে বেঁধে অন্যপ্রান্তে একটা করে ইঁদুর জুড়ে দেয়া হলো। একেকটা ইঁদুরের তুলনায় গাড়িটা হাজার গুণ বড়ো হলেও দেখা গেল, সমস্ত ইঁদুর একসঙ্গে মিলে সেটা বেশ সহজেই টেনে নিয়ে যেতে পারছে। কাকতাড়ুয়া এবং টিনের কাঠুরে গাড়ির ওপর উঠে বসলো। তারপরও অদ্ভুত অশ্ববাহিনী দ্রুত টেনে নিয়ে চললো সেটা। দেখতে দেখতে তারা ঘুমন্ত সিংহের কাছে পৌঁছে গেল।

সিংহের ওজন অনেক। সবাই মিলে প্রচুর খাটুনি খেটে শেষ পর্যন্ত তাকে কোনরকমে গাড়িতে তুলতে পারলো। রানী সঙ্গে সঙ্গে তার ইঁদুরবাহিনীকে তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যেতে নির্দেশ দিলো। তার ভয়, পপি ফুলের বনে বেশিক্ষণ থাকলে ইঁদুরেরাও ঘুমিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

পড়বে হয়তো।

গাড়ি এখন যথেষ্ট ভারী। সংখ্যায় অনেক হলেও খুদে ইঁদুরের পাল প্রথমে গাড়িটা নড়াতেই হিমসিম খেয়ে গেল। কাঠুরে আর কাকতাড়ুয়া তখন পেছন থেকে ঠেলতে শুরু করলো। এবার গাড়ি টানার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল ইঁদুরদের জন্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পপি ফুলের বন ছাড়িয়ে সিংহকে সবুজ মাঠের ভেতর নিয়ে এলো। পপি ফুলের বিষাক্ত গন্ধ নেই এখানে। মিষ্টি তাজা বাতাসে শ্বাস নিতে পারবে সিংহ এবার।

ডরোথি এগিয়ে এসে ইঁদুরদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। সিংহকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে রানীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালো সে। প্রকাণ্ড সিংহকে ডরোথির এতো ভালো লেগে গেছে যে সে উদ্ধার পাওয়ায় তার আনন্দের সীমা নেই।

ইঁদুরগুলোকে গাড়ি থেকে খুলে দেয়া হলো। ঘাসের ভেতর দিয়ে ছুটে নিজেদের বাসার দিকে চলে গেল তারা।

সবার শেষে রানী ইঁদুরের বিদায়ের পালা। খুদে একটা বাঁশি বের করে ডরোথিকে দিলো সে। বললো :

'আবার যদি কখনো আমাদের সাহায্যের দরকার মনে করো তোমরা, মাঠের ভেতর এসে এটা বাজাবে। তোমাদের ডাক শুনতে পাবো আমরা, সাহায্য করতে চলে আসবো। বিদায়!'

'বিদায়!' সবাই উত্তর দিলো।

ছুটে চলে গেল রানী, দূরে মিলিয়ে গেল। ডরোথি টোটোকে শক্ত করে ধরে রাখলো—যদি আবার সে রানীর পিছু ধাওয়া করে তাকে ভয় পাইয়ে দেয়!

এরপর সিংহের ঘুম ভাঙবার অপেক্ষায় ওরা তার পাশে বসে

রইলো। কাকতাড়ুয়া কাছের একটা গাছ থেকে ডরোথিকে কিছু ফল পেড়ে এনে দিলো। সেগুলো দিয়েই রাতের খাবার সেরে নিলো ডরোথি।

www.boiRboi.blogspot.com

দশ

পপির বনে অচেতন অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়ে ছিলো ভীরু সিংহ, ফুলের মারাত্মক গন্ধের ভেতর ডুবে ছিলো। তাই ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হলো তার। চোখ মেলে তাকিয়েই গড়িয়ে নেমে পড়লো সে গাড়ি থেকে। এখনও বেঁচে আছে দেখে দারুণ খুশি হয়ে উঠলো।

'যতো জোরে সম্ভব ছুটেছিলাম আমি,' বসে পড়ে হাই তুলতে তুলতে বললো সে, 'তবু ফুলের গন্ধে শেষ পর্যন্ত কাবু হয়ে গেছি। কী করে ওখান থেকে আমাকে সরিয়ে আনলে তোমরা?'

ওরা তখন মেঠো ইঁদুরদের কথা বললো সিংহকে। ইঁদুরের দল কীভাবে দয়া করে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে, সব খুলে বললো:

ভীরু সিংহ হেসে উঠে বললো:

'নিজেকে সবসময় খুব প্রকাণ্ড আর ভয়ঙ্কর বলে মনে করেছি আমি। অথচ আজ সামান্য ফুলের হাতে আমার প্রাণ যেতে বসেছিল। আবার তারপর কিনা ইঁদুরের মতো নগণ্য এক প্রাণীর দয়ায় আমার জীবন রক্ষা পেলো। কী অদ্ভুত ব্যাপার, বলো তো। যাই হোক, এখন আমরা কী করবো?'

'হলদে ইটের রাস্তায় না পড়া পর্যন্ত আমরা আগের মতোই

এগিয়ে যেতে থাকবো,' বললো ডরোথি, 'তারপর রাস্তা ধরে আবার রওনা হবো পান্নানগরীর দিকে।'

বিশ্রাম নিয়ে সিংহ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার পর আবার যাত্রা শুরু করলো ওরা। নরম সবুজ ঘাসের ভেতর দিয়ে হাঁটতে এখন সবার খুব ভালো লাগছে। কিছুদূর যেতেই হলদে ইটের রাস্তা পেয়ে গেল। বাঁক নিয়ে আবার যাত্রা করলো মহাশক্তিমান ওজের আবাস পান্নানগরীর দিকে।

রাস্তা এখন বেশ মসৃণ। সুন্দর করে ইট পাতা রয়েছে। যে-এলাকার ভেতর দিয়ে এখন চলেছে ওরা, তা-ও খুব সুন্দর। বিপদ-সঙ্কুল অন্ধকার বন অনেক পেছনে ফেলে এসে দলের সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। আবার রাস্তার ধার দিয়ে বেড়া দেখতে পাচ্ছে ওরা, তবে এদিকের বেড়ার রঙ সবুজ। একটু পরে ছোট একটা বাড়ি দেখা গেল, নিশ্চয় কোনো কৃষকের বাড়ি—সেটাও আগাগোড়া সবুজ রঙে রঙ করা। সারা বিকেলে একই রকম আরো অনেকগুলো বাড়ি পড়লো ওদের পথে। কোনো কোনো বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকলো যেন ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু প্রকাণ্ড সিংহের ভয়ে কেউ কাছে আসতে সাহস করলো না, কথাও বললো না। ওরা লক্ষ্য করলো, চমৎকার পান্নাসবুজ রঙের পোশাক সবার পরনে, মাথায় মাঞ্চ্‌কিনদের মতো লম্বা চূড়াওয়ালা টুপি।

'এটাই নিশ্চয় ওজের রাজ্য,' বললো ডরোথি, 'আমরা বোধ হয় পান্নানগরীর কাছে এসে পড়েছি।'

'হ্যাঁ, তাই হবে,' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো। 'মাঞ্চ্‌কিনদের দেশে দেখে এসেছি, তাদের প্রিয় রঙ নীল; আর এখানে দেখছি সবকিছুই

www.boiRboi.blogspot.com

সবুজ। তবে এখানকার লোকজন বোধ হয় মাঞ্চ্‌কিনদের মতো ততো মিশুক নয়। আমার তো মনে হচ্ছে, রাত কাটাবার মতো কোনো জায়গা এখানে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে।'

'কিন্তু শুধু ফল খেয়ে আর কতো থাকা যায়—এবার অন্য খাবার কিছু চাই আমার,' ডরোথি বললো। 'এদিকে টোটো তো একরকম না খেয়েই আছে। পথে এবার প্রথম যে-বাড়িটা পড়বে সেটাতে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলবো আমরা।'

একটু পরে একটা বড়োসড়ো খামারবাড়ি চোখে পড়লো ওদের। ডরোথি নির্দ্বিধায় এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিলো।

সামান্য একটু ফাঁক হলো দরজা। ভেতর থেকে এক মহিলা উঁকি দিলো। 'কী চাই তোমার, খুকি?' জানতে চাইলো সে, 'তোমার সঙ্গে ওই প্রকাণ্ড সিংহ কেন?'

'যদি আপত্তি না করো, আমরা রাতটা তোমাদের এখানে কাটাতে চাই,' ডরোথি বললো। 'সিংহ আমার সহযাত্রী বন্ধু—তোমাদের কোনো অনিষ্ট সে কিছুতেই করবে না।'

'পোষা সিংহ?' দরজাটা আরো একটু খুলে প্রশ্ন করলো মহিলা।

'পোষা বইকি।' বললো ডরোথি, 'তাছাড়া বড্ড ভীতু ও; তোমরা ওকে দেখে যতোটা ভয় পাচ্ছো, তোমাদের দেখে ও ভয় পাবে তারও চেয়ে বেশি।'

কিছুক্ষণ ভাবলো মহিলা, গলা বাড়িয়ে সিংহকে আরেকবার ভালো করে দেখলো। 'বেশ,' বললো তারপর, 'তা-ই যদি হয় তাহলে ভেতরে আসতে পারো তোমরা। খেতে পাবে এখানে, ঘুমোবার জায়গা পাবে।'

আশ্বাস পেয়ে ওরা সবাই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো। বাড়িতে

মহিলা ছাড়া আর রয়েছে হু'টি ছেলেমেয়ে আর একজন পুরুষলোক। পায়ে চোট পেয়েছে লোকটা, তাই ঘরের এককোণে বিছানায় শুয়ে আছে। অদ্ভুত এই দলটা দেখে তারা ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল।

মহিলা টেবিলে খাবার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। লোকটা হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলো :

'কোথায় যাচ্ছো তোমরা সবাই ?'

'পান্নানগরীতে,' বললো ডরোথি, 'মহাশক্তিমান ওজের সঙ্গে দেখা করতে।'

'তাই নাকি !' সবিস্ময়ে বলে উঠলো লোকটা, 'ঠিক জানো, ওজ তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে ?'

'কেন করবে না ?' ডরোথির উত্তর।

'না—শুনেছি, সে কখনো কাউকে দেখা দেয় না। আমার কথাই ধরো। অনেকবার পান্নানগরীতে গেছি আমি—অদ্ভুত সুন্দর জায়গা—কিন্তু মহামান্য ওজের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি কখনো পাইনি, আজ পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে বলেও শুনিনি।'

'কখনো বাইরে বেরোয় না সে ?' কাকতাড়ুয়া প্রশ্ন করলো।

'কক্ষনো না। দিনের পর দিন সে তার প্রাসাদের বিশাল দরবার-ঘরে বসে কাটিয়ে দেয়। এমনকি তার পরিচারকেরাও কখনো তাকে মুখোমুখি দেখতে পায় না।'

'কীরকম দেখতে সে ?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'বলা কঠিন,' চিন্তিতভাবে বললো লোকটা। 'ওজ একজন বিরাট জাহুকর—ইচ্ছেমতো যে-কোনো রূপ সে ধরতে পারে। সেজন্যেই কেউ বলে পাখির মতো দেখতে সে, কেউ বলে হাতির মতো, আবার কেউ কেউ বলে অবিকল বেড়ালের মতো তার চেহারা। কারো

www.boiRboi.blogspot.com

চোখে সে আবার ধরা দেয় সুন্দরী পরীর বেশে, কিংবা তার ইচ্ছে-মতো অন্য যে-কোনো রূপ ধরে। কিন্তু আসলে ওজ যে কী, কোন্‌টা তার আসল চেহারা, কেউ বলতে পারে না।'

'ভারী অদ্ভুত ব্যাপার !' বললো ডরোথি। 'কিন্তু যেভাবেই হোক তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে, নইলে যে এতদুর আসার কোনো অর্থই থাকবে না।'

'ভয়াবহ ওজের সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন তোমরা ?' লোকটা জানতে চাইলো।

'আমি তার কাছে খানিকটা মগজ চাইবো,' ব্যাকুল স্বরে বললো কাকতাড়ুয়া।

'হ্যাঁ, তা ওজ সহজেই দিতে পারবে,' লোকটা আশ্বাস দিলো, 'প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মগজ আছে তার।'

'আর আমি তার কাছে চাইবো একটা হৃৎপিণ্ড,' বললো টিনের কাঠুরে।

'তাতেও কোনো অসুবিধে নেই,' লোকটা বললো, 'নানা আকা-রের নানা আকৃতির অনেক হৃৎপিণ্ড আছে ওজের সংগ্রহে।'

'আর আমার দরকার খানিকটা সাহস,' ভীরু সিংহ জানালো।

'দরবারঘরে বড়ো একটা পাত্র ভর্তি করে সাহস রেখে দিয়েছে ওজ,' বললো লোকটা, 'যাতে উপচে পড়ে না যায় সেজন্যে একটা সোনার থালা দিয়ে পাত্রটা ঢাকা দিয়ে রেখেছে। চাইলেই খানিকটা সাহস সে তোমাকে খুশিমনে দিয়ে দেবে।'

'আর আমি তাকে বলবো আমাকে ক্যানসাসে ফেরত পাঠিয়ে দিতে,' সবশেষে বললো ডরোথি।

'ক্যানসাস আবার কোথায় ?' লোকটা আশ্চর্য হয়ে জানতে

চাইলো।

'জানি না,' ডরোথি বিষণ্ণ স্বরে উত্তর দিলো। 'তবে সেখানেই যখন আমার বাড়ি, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নিশ্চয় হবেই জায়গাটা।'

'হবারই কথা। ভাবনা ক'রো না, সব করতে পারে ওজ, তোমাকে ক্যানসাসের পথও বলে দিতে পারবে নিশ্চয়। কিন্তু আগে তো তার সঙ্গে দেখা করতে হবে তোমাদের। কাজটা সোজা নয়। জাদুকর কারো সঙ্গে দেখা করতে পছন্দ করে না, নিজের খেয়ালখুশি-মতো চলে সে সাধারণত।' টোটোর দিকে চাইলো এবার লোকটা, 'কিন্তু তুমি কী চাও বললে না তো?'

উত্তরে টোটো শুধু লেজ নাড়ালো। অবাক ব্যাপার, সে কথা বলতে পারে না।

এমন সময় মহিলা ওদের ডেকে বললো, খাবার তৈরি।

টেবিলের চারপাশে বসে পড়লো সবাই। ডরোথি খেলো খানিকটা সুস্বাদু পরিজ, ডিম আর নরম শাদা রুটি। খুব ভালো লাগলো তার খাবারগুলো। সিংহ খানিকটা পরিজ খেলো, কিন্তু জিনিসটা মোটেই মজাদার মনে হলো না তার কাছে। তার মতে, ওটের তৈরি খাবার ওটা, আর ওট হচ্ছে ঘোড়ার খাদ্য, সিংহের নয়। কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরে কিছুই খেলো না। টোটো সবকিছুই একটু একটু করে চেখে দেখলো—অনেকদিন পর আবার ভালো খাবার পেয়ে সে খুব খুশি।

খাওয়া শেষ হলে ঘুমোবার জন্যে ডরোথিকে একটা বিছানা দেখিয়ে দিলো মহিলা। ডরোথির পাশে টোটোও শুয়ে পড়লো। সিংহ ঘরের দরজায় শুয়ে পাহারায় রইলো যাতে ডরোথির ঘুমের

www.boiRboi.blogspot.com

কোনো ব্যাঘাত না হয়। কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরের তো ঘুম বলে কিছু নেই, তারা দু'জন সারারাত ঘরের এককোণে চুপচাপ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়লো ওরা। হলদে ইটের রাস্তা ধরে কিছুদূর যেতেই দেখতে পেলো, ঠিক সোজাসুজি সামনে আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে এক অদ্ভুত সুন্দর সবুজ দ্যুতি।

'ওই নিশ্চয় পান্নানগরী!' ডরোথি বলে উঠলো।

যতোই এগোতে থাকলো ওরা, সবুজ আলোর আভা ততোই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের দীর্ঘ যাত্রার অবসান হতে যাচ্ছে বুঝি শেষ পর্যন্ত।

তবু আরো নেহাত কম পথ পাড়ি দিতে হলো না। যখন প্রকাণ্ড নগরপ্রাচীরের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো ওরা, তখন বিকেল হয়ে গেছে। অনেক উঁচু, চওড়া প্রাচীর। আগাগোড়া উজ্জ্বল সবুজ রঙে রঙ করা।

ওদের সামনে হলদে ইটের রাস্তার শেষ মাথায় বিশাল এক তোরণ। সেটার গায়ে অসংখ্য পান্না বসানো। রোদে এমন ঝিক্‌মিক্ করছে সেগুলো যে কাকতাড়ুয়ার এঁকে-দেয়া চোখদু'টো পর্যন্ত ধাঁধিয়ে গেল।

তোরণের পাশে একটা ঘণ্টা। ডরোথি সেটাতে নাড়া দিতেই মিষ্টি টুংটাং আওয়াজ উঠলো। ধীরে ধীরে খুলে গেল প্রকাণ্ড সিংহদ্বার। ওরা সবাই ভেতরে ঢুকে পড়লো, এসে দাঁড়ালো উঁচু-একটা গম্বুজ-আকৃতির ঘরের মধ্যে। ঘরের দেয়ালে অজস্র পান্না ঝক্‌মক্ করছে।

ওদের সামনে খাটো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাঞ্চ্‌কিনদের

মতো আকার হবে লোকটার। আগাগোড়া সবুজ পোশাকে ঢাকা তার শরীর, এমনকি তার গায়ের রঙও সবুজ ধরনের। তার পাশে রয়েছে মস্ত একটা সবুজ বাক্স।

ডরোথি আর তার সঙ্গীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে লোকটা জানতে চাইলো, 'পান্নানগরীতে কী চাও তোমরা?'

'আমরা এখানে এসেছি মহামান্য ওজের সঙ্গে দেখা করতে,' ডরোথি বললো।

উত্তরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল লোকটা। হতবুদ্ধি হয়ে তৎক্ষণাৎ বসে পড়লো সে, ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগলো।

'বহুকাল হলো এমন কথা শুনিনি আমি কারো মুখে—কেউ ওজের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি,' বিমূঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো সে। 'শুধু মহাশক্তিধর নন ওজ, তিনি ভয়ঙ্কর। তোমরা যদি আজেবাজে কোনো কারণে অনর্থক তার মহামূল্যবান সময় নষ্ট করতে এসে থাকো, তিনি সাংঘাতিক রুষ্ট হতে পারেন—ইচ্ছে করলে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারেন তোমাদের সবাইকে।'

'আজেবাজে কোনো কাজ নিয়ে অনর্থক আসিনি আমরা,' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো। 'আমরা দরকারী কাজে এসেছি। তাছাড়া আমরা শুনেছি, ওজ খুব দয়ালু।'

'ঠিকই শুনেছো,' বললো সবুজ লোকটা, 'বিচক্ষণতার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে পান্নানগরী শাসন করেন ওজ। তাঁর সুশাসনে সবাই তুষ্ট। কিন্তু অসৎ যারা, কিংবা যারা শুধু কৌতূহলের কারণে তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়, তাদের প্রতি তিনি ভয়ঙ্কর নির্মম। এ-পর্যন্ত খুব কম লোকই তার মুখ দেখতে চাওয়ার সাহস করেছে। যাই হোক, আমি নগররক্ষী—তোমরা যখন মহামান্য ওজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

www.boiRboi.blogspot.com

চাইছো, আমার কর্তব্য তাঁর প্রাসাদে তোমাদের নিয়ে যাওয়া। তবে তার আগে তোমাদের চশমা প'রে নিতে হবে।'

'কেন?' জানতে চাইলো ডরোথি।

'কারণ চশমা না প'রে নিলে পান্নানগরীর সৌন্দর্য আর দ্যুতিতে তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এ-শহরে যারা বসবাস করে তাদেরও রাতদিন চশমা প'রে থাকতে হয়। সবার চোখে চশমা এঁটে তালা লাগিয়ে দেয়া আছে—শহর যখন প্রথম তৈরি হয় তখন থেকেই ওজের নির্দেশে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটামাত্র চাবি দিয়ে চশমা খোলা যায়; সেটা রয়েছে আমার কাছে।'

পাশে রাখা বিরাট বাক্সটা খুললো নগররক্ষী। ডরোথি দেখলো, নানা আকারের আর নানা আকৃতির অসংখ্য চশমায় ভর্তি সেটা। সব চশমার কাচই সবুজ রঙের। নগররক্ষী ডরোথির জন্যে একজোড়া চশমা বেছে নিয়ে তার চোখে বসিয়ে দিলো। চশমার সঙ্গে দু'টো সোনালি বন্ধনী লাগানো। সে-দু'টো ডরোথির কপালের দু'পাশ দিয়ে মাথার পেছনদিকে নিয়ে গিয়ে নগররক্ষী তার গলার চেনের সঙ্গে ঝোলানো একটা ছোট্ট চাবি দিয়ে আটকে দিলো। এবার ডরোথি চাইলেও চশমা খুলতে পারবে না চোখ থেকে। অবশ্য পান্নানগরীর দ্যুতিতে চোখ নষ্ট হয়ে যাক, তা সে মোটেই চায় না। সেজন্যে বললো না কিছুই।

সবুজ লোকটা এবার একে একে কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরে, সিংহ, এমনকি খুদে টোটোর চোখেও চশমা লাগিয়ে দিলো। সেই একই চাবি দিয়ে শক্ত করে আটকে দিলো সে চশমাগুলো।

সবশেষে নিজের চোখেও চশমা এঁটে নিলো নগররক্ষী। তারপর জানালো, এবার সে ওদের পথ দেখিয়ে প্রাসাদে নিয়ে যাবে।

দেয়ালে গাঁথা একটা পেরেক থেকে বড়ো একটা সোনার চাবি নিয়ে আরেকটা ফটক খুললো সে। তার পিছু পিছু তোরণ পেরিয়ে সবাই পান্নানগরীর রাস্তায় নেমে এলো।

www.boiRboi.blogspot.com

এগারো

সবুজ চশমায় চোখ ঢাকা থাকলেও অপরূপ সেই নগরীর দ্যুতিতে ডরোথি আর তার বন্ধুদের চোখ প্রথমে ঝলসে গেল। রাস্তার দু'-পাশে সবুজ মার্বেল পাথরে তৈরি সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি। আগাগোড়া ঝক্‌মকে পান্নায় খচিত সেগুলো। একইরকম সবুজ মার্বেল পাথরে বাঁধানো পায়ে চলার পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলেছে। পাথরগুলোর জোড় বরাবর বসানো রয়েছে সার সার পান্না, উজ্জ্বল রোদে সেগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। ঘরবাড়ির জানালার শার্সিগুলো সবুজ কাচে তৈরি। এমনকি নগরীর ওপরের আকাশের গায়েও সবুজের আভা। সূর্যের আলোর রঙও যেন সবুজ এখানে।

চারপাশে অনেক লোকজন। নারী, পুরুষ, শিশু—দল বেঁধে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সবার পরনে সবুজ পোশাক, তাদের গায়ের রঙও সবুজাভ। ডরোথি আর তার অদ্ভুত সঙ্গীসাথীর দিকে সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে। সিংহকে দেখে ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তাদের মায়েদের পেছনে। কিন্তু কেউই ওদের সঙ্গে কথা বলছে না।

রাস্তায় প্রচুর দোকানপাট। ডরোথি লক্ষ্য করলো, সব দোকানের সমস্ত জিনিসপত্রই সবুজ রঙের। সবুজ পাত্রভর্তি সবুজ মিঠাই আর

সবুজ বই বিক্রির জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তেমনি দোকানে দোকানে শোভা পাচ্ছে সবুজ জুতো, সবুজ টুপি, নানা ধরনের সবুজ কাপড়চোপড়। এক জায়গায় ডরোথি দেখলো, একজন লোক সবুজ শরবত বিক্রি করছে, আর ছেলেমেয়েরা তা কিনছে সবুজ পয়সার বিনিময়ে।

মনে হচ্ছে, শহরে ঘোড়া কিংবা অন্য কোনরকম ভারবাহী জানোয়ার নেই। লোকজন ছোট ছোট সবুজ ঠেলাগাড়িতে করে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে। সবাইকে মনে হচ্ছে সুখী, পরিতৃপ্ত, সচ্ছল।

নগররক্ষী ওদের নিয়ে রাস্তা ধরে বেশ কিছুদূর হেঁটে নগরীর ঠিক মাঝখানে বিশাল এক অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়ালো। এটাই মহাশক্তিমান জাদুকর ওজের প্রাসাদ। দরজার সামনে সবুজ উর্দি-পরা একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে লম্বা, সবুজ দাড়ি।

'এরা বিদেশী,' সৈনিকের উদ্দেশে বললো নগররক্ষী, 'মহামান্য ওজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'ভেতরে এসো,' সৈনিক ফটক খুলে ধরে বললো, 'আমি তাঁকে সংবাদ দিচ্ছি।'

প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে ওরা সৈনিকের পিছু পিছু বড়ো একটা কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার কথামতো সবুজ একটা পাপোশে পা মুছে ভেতরে ঢুকলো সবাই। পান্নাখচিত সবুজ রঙের চমৎকার আসবাবপত্র দিয়ে ঘরটা সাজানো, মেঝেতে সবুজ গালিচা পাতা। সৈনিক বিনীতভাবে বললো :

'তোমরা আরাম করে বসো, আমি দরবারঘরের দরজায় গিয়ে মহামান্য ওজকে তোমাদের কথা বলছি।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ওদের। শেষ পর্যন্ত ফিরে এলো

www.boiRboi.blogspot.com

সৈনিক। ডরোথি জিজ্ঞেস করলো :

'দেখা হয়েছে ওজের সঙ্গে?'

'না না,' বলে উঠলো সৈনিক, 'কোনদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কথা বলে এলাম শুধু। তিনি পর্দার আড়ালে বসে ছিলেন, আমি তোমাদের কথা বললাম। জবাবে তিনি বললেন, তোমরা যদি একান্তই চাও, তিনি দেখা করবেন তোমাদের সঙ্গে। তবে শর্ত হচ্ছে, তোমরা প্রত্যেকে আলাদাভাবে একা তাঁর সামনে হাজির হবে, এবং একেক দিনে মাত্র একজনকে তিনি সাক্ষাৎ দেবেন। তার মানে, প্রাসাদে কয়েকদিন থাকতে হচ্ছে তোমাদের। যার যার ঘর দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি এক্ষুণি। অনেক দূর থেকে এসেছো তোমরা, আরামে বিশ্রাম নিতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' বললো ডরোথি, 'ওজের অনেক অনুগ্রহ।'

সৈনিক এবার একটা সবুজ বাঁশিতে ফুঁ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সবুজ সিল্কের সুন্দর গাউন পরা এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকলো। চমৎকার সবুজ চুল তার, চোখগুলোও সবুজ। ডরোথির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকখানি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো সে। তারপর বললো :

'আমার সঙ্গে এসো, তোমার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিলো ডরোথি, তারপর টোটোকে কোলে তুলে নিয়ে সবুজ মেয়েটার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলো।

সাতটা গলিপথ পার হয়ে এবং তিনপ্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওরা প্রাসাদের সামনের দিকের একটা কামরায় এসে পৌঁছুলো। ছোট্ট সেই ঘরের চেয়ে সুন্দর ঘর বুঝি পৃথিবীতে নেই। নরম বিছানার ওপর সবুজ সিল্কের চাদর পাতা রয়েছে, তার ওপর সবুজ মখমলের আচ্ছাদন। ঘরের মাঝখানে খুদে একটা ফোয়ারা। সেখান থেকে

সবুজ সুগন্ধি জল শূন্যে ছিটকে উঠে ফের ঝরে পড়ছে চমৎকার কারুকাজ করা সবুজ মার্বেল পাথরের আধারের ভেতর। জানালায় শোভা পাচ্ছে সুন্দর সবুজ ফুল। ঘরের একদিকে একটা তাকে এক-সারি ছোট ছোট সবুজ বই সাজানো রয়েছে। বইগুলো খুলে ডরোথি দেখলো, সবুজ রঙের অদ্ভুত সব ছবি সেগুলোর পাতায় পাতায়। এমন মজার সেসব ছবি যে ও না হেসে থাকতে পারলো না।

কাপড়ের আলমারিতে অসংখ্য সবুজ পোশাক—সিল্ক, সাটিন আর মখমলে তৈরি। ডরোথি দেখলো, ঠিক তার দেহের মাপে তৈরী প্রত্যেকটা পোশাক।

'নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নাও এখানে,' সবুজ মেয়েটা বললো। 'যদি কোনকিছু দরকার হয় তাহলে ঘণ্টা বাজিয়ো। কাল সকালে ওজ তোমাকে ডেকে পাঠাবেন।'

ডরোথির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েটা দলের অন্যান্য অতিথির কাছে ফিরে এলো। তাদেরও প্রত্যেককে পথ দেখিয়ে আলাদা আলাদা ঘরে নিয়ে গেল। প্রত্যেকে প্রাসাদের এক একটা চমৎকার ঘরে ঠাঁই পেলো।

কাকতাড়ুয়ার বেলায় অবশ্য এই সমাদরের কোনো অর্থই হলো না। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর দরজার মুখে হাবার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে সকালের প্রতীক্ষায়। শুয়ে থেকে লাভ নেই, তাতে তার বিশ্রাম হয় না; চোখও বুজতে পারে না সে। ঘরের কোণে ছোট্ট একটা মাকড়সা জাল বুনছিল, সেটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো সে সারারাত।

টিনের কাঠুরে বিছানায় শুয়ে রইলো শুধু অভ্যাসের বশে—এক-দিন তো সে রক্তমাংসের মানুষ ছিলো। কিন্তু তারও আর এখন ঘুম

www.boiRboi.blogspot.com

বলে কিছু নেই। সারারাত ধরে শরীরের জোড়গুলো নাড়াচাড়া করলো সে, ফলে বেশ চালু রইলো সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

বনের মধ্যে শুকনো পাতার বিছানা পেলেই সিংহের বেশি ভালো লাগতো, ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে থাকা তার পছন্দ নয়। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে লাভ নেই, সে ভালো করেই জানে। কাজেই এক লাফে বিছানায় উঠে বেড়ালের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। মিনিটখানেকের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো সে। গলা দিয়ে গর্‌গর্‌ আওয়াজ বেরোতে লাগলো।

পরদিন সকালে নাশতার পর সবুজ মেয়েটা ডরোথিকে নিয়ে যেতে এলো। সবচেয়ে সুন্দর গাউনগুলোর ভেতর থেকে সবুজ বুটিদার সাটিনের একটা গাউন বেছে নিয়ে ডরোথিকে পরতে দিলো সে। তার ওপর একটা সবুজ সিল্কের এপ্রন পরে নিলো ডরোথি। টোটোর গলায় বেঁধে দিলো সবুজ একটা রিবন। তারপর তারা মহাশক্তিমান ওজের দরবারঘরের উদ্দেশে রওনা হলো।

প্রথমে একটা বড়ো হলঘরে এসে পৌঁছুলো ওরা। ওজের দর-বারের বহু সম্ভ্রান্ত নারী-পুরুষ পারিষদ সেখানে বসে রয়েছে। সবার পরনে দামী পোশাক। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার নেই। ওজের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মেলেনি কোনদিন—তবু প্রতিদিন সকালে আসে তারা, দরবারঘরের বাইরে বসে অপেক্ষা করে। ডরোথি হলঘরে ঢুকতেই সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকালো। একজন ফিস্‌ফিস্‌ করে জানতে চাইলো:

'সত্যিই কি ভয়াল ওজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো তুমি?'

'নিশ্চয়ই,' উত্তর দিলো ডরোথি, 'ওজের যদি দেখা দিতে আপত্তি

না থাকে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি,' জাদুকরের কাছে ডরোথির খবর নিয়ে গিয়েছিল যে-সৈনিক, সে বলে উঠলো। 'এমনিতে অবশ্য লোকে দেখা করতে চাইলে তিনি রুষ্ট হন। সত্যি বলতে কি, তোমাদের কথা শুনে প্রথমে খুব রেগে গিয়েছিলেন তিনি, যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। তারপর আবার কী ভেবে জানতে চাইলেন, তোমরা দেখতে কেমন। তোমার রুপোর জুতোর কথা বলতেই খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। শেষে আমি যখন তোমার কপালের ছাপের কথা বললাম তখন ঠিক করলেন, তোমাদের দর্শন দেবেন।'

এমন সময় ঘন্টা বেজে উঠলো। সবুজ মেয়েটা ডরোথিকে বললো, 'ওই যে, সঙ্কেত শোনা গেল। দরবারঘরে একা ঢুকবে তুমি।'

ছোট একটা দরজা খুলে ধরলো মেয়েটা। ডরোথি দৃঢ় পায়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। পরমুহূর্তে দেখলো, অদ্ভুত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও। বিশাল, গোলাকার একটা ঘর। ছাদটা উঁচু গম্বুজ আকৃতির। দেয়াল, ছাদ এবং মেঝেতে বসানো রয়েছে অসংখ্য বড়ো বড়ো পান্না। ছাদের ঠিক কেন্দ্রে প্রকাণ্ড একটা আলো জ্বলছে—সূর্যের মতো উজ্জ্বল। সেই আলোর দীপ্তিতে পান্নাগুলো আশ্চর্যরকম ঝক্‌মক্‌ করছে।

তবে ডরোথি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ মার্বেল পাথরে তৈরি বিশাল সিংহাসনটা দেখে। অন্য সবকিছুর মতো চেয়ার আকৃতির সেই সিংহাসনও ঝক্‌মকে পান্নায় খচিত। সিংহাসনের ঠিক মাঝখানে শূন্যে ভেসে আছে প্রকাণ্ড একটা মাথা। সেটার সঙ্গে না আছে কোনো ধড়, না আছে

www.boiRboi.blogspot.com

হাত-পা। একটাও চুল নেই মাথায়—তবে চোখ আছে, নাক আছে, মুখ আছে। বিশালতম দৈত্যের মাথার চেয়েও অনেক বড়ো হবে মাথাটা।

ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ডরোথি সেই আজব মুণ্ডের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিলো। এমন সময় বিশাল চোখদু'টো ধীরে ধীরে ঘুরে স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো তার দিকে। তারপরই নড়ে উঠলো দু'ঠোঁট—একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ডরোথি :

'আমিই ওজ, মহাশক্তিমান ভয়াল ওজ। তুমি কে? কেন আমার সাক্ষাৎ চেয়েছো?'

অতোবড়ো মাথার ভেতর থেকে যতোটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরোবে বলে ডরোথি ভেবেছিল, স্বরটা ঠিক ততো ভয়াবহ মনে হলো না। তাই সাহসে ভর করে সে জবাব দিলো :

'আমি ডরোথি, নম্র নগণ্য ডরোথি। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।'

চোখদু'টো পুরো এক মিনিট তার দিকে চিন্তামগ্নভাবে চেয়ে রইলো। তারপর আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ :

'রুপোর জুতোজোড়া তুমি কোথায় পেলে?'

'পূর্বরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীর জুতো এগুলো,' ডরোথি জানালো। 'তার গায়ের ওপর আমার ঘর উড়ে এসে পড়ায় সে মারা গেছে।'

'তোমার কপালের ওই ছাপ কোত্থেকে এলো?'

'উত্তররাজ্যের মায়াবিনী আমাকে পাঠিয়েছে তোমার কাছে,' বললো ডরোথি, 'বিদায়ের আগে সে আমার কপালে চুমু দিয়েছিল।'

আবার কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো চোখদু'টো; যেন বুঝে নিলো, ডরোথি সত্যি কথাই বলছে।

'তোমার জন্যে আমাকে কী করতে বলো ?' আবার জিজ্ঞেস করলো ওজ।

'ক্যানসাস ফেরত পাঠিয়ে দাও আমাকে,' ব্যাকুল স্বরে বললো ডরোথি, 'আমার এম কাকী আর হেনরি কাকা সেখানেই থাকে। তোমাদের দেশ খুব সুন্দর, তবু এখানে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। আর তাছাড়া আমাকে এতদিন না দেখে এম কাকী নিশ্চয়ই সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা করছে।'

চোখের পাতা তিনবার পড়লো-উঠলো, তারপর ভয়াল দৃষ্টি ঘুরে গেল ছাদের দিকে—আবার নেমে এলো মেঝেয়। চারদিকে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগলো চোখদু'টো, যেন ঘরের প্রতিটি কোণ খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। সবশেষে আবার ডরোথির ওপর এসে স্থির হলো দু'চোখের দৃষ্টি।

'কেন আমি তোমাকে সাহায্য করবো ?' জানতে চাইলো ওজ।

'কারণ তুমি শক্তিমান, আর আমি দুর্বল; তুমি একজন বিরাট জাদুকর, আর আমি এক অসহায় ছোট্ট মেয়ে মাত্র।'

'কিন্তু পূর্বরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীকে বধ করার মতো যথেষ্ট শক্তি তো তোমার আছে,' ওজ বললো।

'সে তো এমনি ওরকম ঘটে গেছে,' সরল মনে বললো ডরোথি, 'ওতে আমার নিজের কোনো হাত ছিলো না।'

'যাই হোক,' বিশাল মুণ্ড বললো, 'আমার জবাব শুনে নাও। আমার কোনো উপকার যদি তোমাকে দিয়ে না হয়, তাহলে তোমাকে ক্যানসাস ফেরত পাঠাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করার কোনো অধিকার তোমার নেই জেনো। এদেশে কাউকে কিছু পেতে হলে তা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে পেতে হয়। জাদুর ক্ষমতা দিয়ে আমি

www.boiRboi.blogspot.com

তোমাকে আবার বাড়িতে ফেরত পাঠাবার-ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু তার আগে আমার জন্যে তোমাকে কিছু করতে হবে। আগে আমাকে সাহায্য করো, তবেই আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

'কী করতে হবে আমাকে ?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'পশ্চিমরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীকে ধ্বংস করতে হবে,' জবাব দিলো ওজ।

'সে আমি কী করে পারবো।' দারুণ বিস্ময়ে বলে উঠলো ডরোথি।

'পূর্বরাজ্যের ডাইনীকে বধ করেছো তুমি। তাছাড়া তোমার পায়ে আছে রুপোর জুতো—জাদুর ওই জুতোর ক্ষমতা অনেক। গোটা দেশে এখন আর মাত্র একজন দুষ্ট ডাইনী অবশিষ্ট আছে। যখন তুমি বলতে পারবে সে ধ্বংস হয়েছে, শুধু তখনই আমি তোমাকে ক্যানসাস ফেরত পাঠাবো—তার আগে নয়।'

ছোট্ট ডরোথি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো, দারুণ নিরাশায় ছেয়ে গেছে তার মন।

চোখদু'টোর পাতা ওঠা-নামা করলো আবার। সাগ্রহে চেয়ে আছে ডরোথির দিকে—যেন মহাশক্তিমান ওজের ধারণা, ডরোথি চাইলেই তাকে সাহায্য করতে পারে।

'আমি কোনদিন স্বেচ্ছায় কোনকিছু মারিনি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো ডরোথি। 'দুষ্ট ডাইনীকে মারতে চাইও যদি, কী করে মারবো ? মহাশক্তিমান ভয়াল ওজ হয়ে যদি তুমি তাকে মারতে না পারো, আমি কীভাবে পারবো বলে তুমি আশা করো ?'

'তা আমি জানি না,' মাথার কাছ থেকে জবাব এলো। 'তবে আমার যা বলার ছিলো আমি বলে দিয়েছি। দুষ্ট ডাইনীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমার কাকা-কাকীকে তুমি দেখতে পাচ্ছো না। মনে

রেখো, ডাইনীটা খুব খারাপ—ভয়ানক খারাপ—তাকে বধ করা একান্ত দরকার। এবার যাও, তোমার কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত আর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না।'

দুঃখভারাক্রান্ত মনে ডরোথি দরবারঘর থেকে বেরিয়ে সিংহ, কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরের কাছে ফিরে এলো। ওজ তাকে কী বলে শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা।

'কোনো আশা নেই আমার,' বিষণ্ণ সুরে বললো ডরোথি, 'পশ্চিমরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীকে আমি বধ না করা পর্যন্ত ওজ আমাকে বাড়িতে ফেরত পাঠাবে না—আর কাজটা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।'

তার কথা শুনে সঙ্গীরাও খুব দুঃখ পেলো, কিন্তু তাকে সাহায্য করার কোনো উপায় কেউ দেখলো না। নিজের ঘরে ফিরে গেল ডরোথি। বিছানায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিক কাকতাড়ুয়ার কাছে এসে বললো :

'এসো আমার সঙ্গে, ওজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

সৈনিকের পিছু পিছু রওনা হলো কাকতাড়ুয়া। একটু পরে বিশাল দরবারঘরে তার ডাক পড়লো। ভেতরে ঢুকে সে দেখতে পেলো, পান্নার সিংহাসনে বসে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী। সবুজ সিল্কের স্বচ্ছ পোশাক তার পরনে। ঢেউ-খেলানো সবুজ চুলের ওপর বসানো রয়েছে মণিমুক্তাখচিত একটা মুকুট। তার কাঁধের দু'পাশে বিচিত্র বর্ণের দু'টো অপরূপ পাখা শোভা পাচ্ছে। এতো হালকা সেই পাখা যে মৃদুতম বাতাসের ছোঁয়াতেই আন্দোলিত হয়ে উঠছে।

সুন্দরী এই রমণীর সামনে কাকতাড়ুয়া তার খড়ভর্তি শরীর নিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

যতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে ঝুঁকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো। মহিলা প্রসন্ন মুখে চাইলো তার দিকে। তারপর বললো :

'আমি ওজ, মহাশক্তিমান ভয়াল ওজ। কে তুমি? কেন আমার সাক্ষাৎ চেয়েছো?'

ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছে কাকতাড়ুয়া। ডরোথির কাছে যে প্রকাণ্ড মাথার কথা শুনেছে, সেটাই দেখতে পাবে বলে ভেবেছিল সে। তবু সাহসের সঙ্গে উত্তর দিলো :

'আমি এক সামান্য কাকতাড়ুয়া, খড় দিয়ে ঠাসা আমার শরীর। সেজন্যেই আমার মাথায় মগজ বলে কিছু নেই। তোমার কাছে আমি প্রার্থনা জানাতে এসেছি, খড়ের বদলে আমার মাথায় মগজ পুরে দাও, যাতে তোমার রাজ্যের অন্য যে-কোনো মানুষের মতো আমিও পুরোপুরি মানুষ বলে গণ্য হতে পারি।'

'তোমার এই উপকার কেন করতে যাবো আমি?' রমণীরূপী ওজ জিজ্ঞেস করলো।

'কারণ তুমি বিজ্ঞ এবং ক্ষমতাবান—তুমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই,' জবাব দিলো কাকতাড়ুয়া।

'বিনিময়ে কিছু না পেলে আমি কখনো কারো উপকার করি না,' বললো ওজ। 'তবে তোমাকে আমি এই কথা দিতে পারি, পশ্চিম-রাজ্যের দুষ্ট ডাইনীকে যদি তুমি বধ করতে পারো, তাহলে তোমার মাথা আমি মগজে ভর্তি করে দেবো। এতো উর্বর সেই মগজ যে সারা ওজের দেশের ভেতর তখন তুমিই হবে সবচেয়ে বিজ্ঞ লোক।'

'কিন্তু আমি শুনেছি, ডাইনীকে মারার ভার দিয়েছো তুমি ডরোথিকে,' কাকতাড়ুয়া আশ্চর্য হয়ে বললো।

'তা দিয়েছি। কে মারলো ডাইনীকে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা

নেই। কিন্তু ডাইনীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করবো না। এবার যাও, তোমার অতি সাধের মগজ পাবার উপযুক্ত কাজ সমাধা করে তবেই এসো আমার সঙ্গে দেখা করতে—তার আগে নয়।'

বিষণ্ণ মনে বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো কাকতাড়ুয়া। কী বলেছে ওজ, সবাইকে জানালো। ডরোথি শুনে অবাক হয়ে গেল, জাদুকর ওজ আসলে তার দেখা সেই বিশাল মুণ্ড নয়, সে এক সুন্দরী রমণী।

'সে যা-ই হোক,' বললো কাকতাড়ুয়া, 'টিনের কাঠুরের মতো ওই মহিলারও বোধ হয় একটা হৃৎপিণ্ড দরকার—ওর হৃদয় আছে কিনা সন্দেহ।'

তার পরদিন সকালে সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিক টিনের কাঠুরের কাছে এসে বললো :

'ওজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এসো আমার সঙ্গে।'

সৈনিকের পিছু পিছু রওনা হলো টিনের কাঠুরে। বিশাল দরবার-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। কেমন চেহারা দেখবে ওজের—পরমাসুন্দরী রমণী, না প্রকাণ্ড একটা মাথা—তা তার জানা নেই। তবে মনে মনে চাইছে, সুন্দরী মহিলাকেই যেন দেখতে পায়। 'যদি মাথার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়,' ভাবছে সে, 'হৃৎপিণ্ড পাবার কোনো আশা নেই আমার। কারণ শুধু মাথার তো নিজেরই কোনো হৃৎপিণ্ড নেই, আমার দুঃখ সে কী করে বুঝবে? তার বদলে যদি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে দেখা হয়, আমি খুব করে কাকুতি-মিনতি করে একটা হৃৎপিণ্ড চেয়ে নিতে পারবো; কারণ শোনা যায় নারীমাত্রেই কোমলহৃদয়।'

কিন্তু বিশাল দরবারঘরে ঢুকে টিনের কাঠুরে মাথাও দেখতে পেলো না, সুন্দরী রমণীও দেখতে পেলো না। এবার ওজ আত্ম-

www.boiRboi.blogspot.com

প্রকাশ করেছে ভয়ালদর্শন এক জানোয়ারের রূপ ধরে। আকারে প্রায় হাতীর সমান হবে জন্তুটা, তার শরীরের ওজনে সবুজ সিংহাসনটা যেন ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছে। মাথাটা দেখতে গণ্ডারের মাথার মতো হলেও পাঁচ-পাঁচটা চোখ বসানো রয়েছে মুখে। ধড় থেকে পাঁচটা লম্বা বাহু বেরিয়ে এসেছে, সেইসঙ্গে রয়েছে পাঁচটা লম্বা লিকলিকে পা। জানোয়ারটার সারা শরীর ঘন ঝাঁকড়া লোমে ঢাকা। এর চেয়ে ভয়ঙ্করদর্শন বীভৎস কোনো দানবের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। টিনের কাঠুরের ভাগ্য ভালো, এ-মুহূর্তে তার কোনো হৃৎপিণ্ড নেই; নইলে সেটা এতক্ষণে আতঙ্কে ধুপ্‌ধাপ্ লাফাতে শুরু করতো। বরং আগাগোড়া টিনের তৈরি বলে কাঠুরের একটুও ভয় লাগছে না। অবশ্য খুব হতাশ বোধ করছে সে।

'আমিই ওজ, মহাশক্তিমান ভয়াল ওজ,' ভয়ঙ্কর গর্জনের স্বরে বলে উঠলো সেই বিকট জানোয়ার। 'কে তুমি? কেন আমার সাক্ষাৎ চেয়েছো?'

'আমি একজন কাঠুরে। টিনের তৈরি। তাই হৃৎপিণ্ড নেই আমার, ভালোবাসতে পারি না। তোমার কাছে একটা হৃৎপিণ্ড ভিক্ষা চাই, যাতে আমি অন্যসব মানুষের মতো হতে পারি।'

'কেন তোমাকে হৃৎপিণ্ড দিতে যাবো?' জানোয়াররূপী ওজ প্রশ্ন করলো।

'কারণ তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি আমি—এবং শুধু তুমিই আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারো,' কাঠুরে উত্তর দিলো।

চাপা একটা গর্জন করে উঠলো ওজ, তারপর কর্কশ স্বরে বললো, 'সত্যি যদি হৃৎপিণ্ড পেতে চাও, সেটা তোমাকে অর্জন করে নিতে হবে।'

'কীভাবে ?' জানতে চাইলো কাঠুরে।

'পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনী বধের অভিযানে ডরোথিকে সাহায্য করো,' জানোয়ার জবাব দিলো। 'ডাইনী মারা যাবার পর এসো আমার কাছে, ওজের দেশের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে কোমল, সবচেয়ে ভালোবাসাভরা হৃৎপিণ্ড দেবো তোমাকে।'

বাধ্য হয়ে টিনের কাঠুরে দুঃখভারাক্রান্ত মনে বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো। ভয়াল জানোয়ারের কথা বললো তাদের। মহাশক্তিমান জাদুকর এতরকম রূপ ধারণ করতে পারে দেখে সবাই দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেল। সিংহ বললো :

'আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো তখন যদি সে জানোয়ারের রূপ ধরে থাকে তাহলে প্রচণ্ড এক হুঙ্কার দিয়ে উঠবো। তাতে ভয় পেয়ে যাবে সে, যা চাই দিয়ে দেবে। যদি সুন্দরী মহিলার বেশ ধরে থাকে, তাহলে এমন ভান করবো যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি—আমার কথা না শুনে পারবে না তখন। আর যদি ওই প্রকাণ্ড মাথার চেহারা নেয়, তাহলে আর তার রক্ষে নেই। ওই মাথা আমি সারা ঘরে গড়িয়ে নিয়ে বেড়াবো; আমরা যা যা চাই সব দেবে বলে হলপ করবে, তারপর ছাড়বো। কাজেই, বন্ধুরা, মন খারাপ ক'রো না—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন সকালে সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিক এসে সিংহকে বিশাল দরবারঘরের দরজায় নিয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে ওজের সামনে হাজির হতে বললো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সিংহ। এদিক-ওদিক চাইলো। আশ্চর্য হয়ে দেখলো, কেউ নেই কোথাও, শুধু সিংহাসনের সামনে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। সেই গনগনে উজ্জ্বল আগুনের

www.boiRboi.blogspot.com

গোলার দিকে ভালো করে তাকাতে পর্যন্ত পারলো না সে। প্রথমে তার মনে হলো, ওজের গায়ে হঠাৎ কীভাবে যেন আগুন ধরে গেছে, পুড়ে মরছে জাদুকর। তাড়াতাড়ি অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রচণ্ড উত্তাপে গোঁফ ঝল্‌সে গেল তার। কাঁপতে কাঁপতে গুড়ি মেরে পিছিয়ে এলো সে দরজার কাছে।

এমন সময় অগ্নিগোলকের ভেতর থেকে অনুচ্চ শান্ত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো :

'আমি ওজ, মহাশক্তিমান ভয়াল ওজ। তুমি কে ? কেন আমার সাক্ষাৎ চেয়েছো ?'

সিংহ জবাব দিলো, 'আমি এক ভীরু সিংহ, সবকিছুকেই আমি ভয় পাই। তোমার কাছে সাহস ভিক্ষা করতে এসেছি। মানুষ আমাকে পশুরাজ বলে—সাহস পেলে সত্যি সত্যি পশুর রাজা হতে পারি আমি।'

'কেন আমি তোমাকে সাহস দেবো ?' প্রশ্ন করলো ওজ।

'কারণ তুমিই সব জাদুকরের সেরা জাদুকর, আমার ইচ্ছে পূরণের ক্ষমতা শুধু তোমারই রয়েছে,' সিংহ জবাব দিলো।

কিছুক্ষণ দাউদাউ করে জ্বললো আগুনের গোলা, তারপর আবার কণ্ঠ ভেসে এলো :

'দুষ্ট ডাইনীর মৃত্যুর প্রমাণ এনে দাও আমাকে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সাহস দিয়ে দেবো। কিন্তু ডাইনী যতদিন বেঁচে থাকবে, তোমাকে কাপুরুষ হয়েই থাকতে হবে।'

কথাটা শুনে খুব রাগ হলো সিংহের, কিন্তু উত্তরে সে কিছুই বলতে পারলো না। চুপচাপ আগুনের গোলার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ এমন লেলিহান ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো আগুনের শিখা যে লেজ

গুটিয়ে একছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে। বন্ধুরা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তাদের কাছে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। জাদুকরের সঙ্গে তার ভয়াল সাক্ষাৎকারের কাহিনী শোনালো সে তাদের।

'এখন তাহলে কী করবো আমরা ?' ডরোথি করুণ সুরে বললো।

'শুধু একটা জিনিসই করার আছে এখন,' জবাব দিলো সিংহ, 'উইঙ্কিদের দেশে যেতে হবে আমাদের, দুষ্ট ডাইনীকে খুঁজে বের করে তাকে ধ্বংস করতে হবে।'

'কিন্তু, ধরো, যদি তা না পারি ?' বললো ডরোথি।

'তাহলে কোনদিন সাহস পাবো না আমি,' সিংহ বললো।

'আমার কোনদিন মগজ পাওয়া হবে না,' কাকতাড়ুয়া যোগ করলো।

'আর আমি হৃৎপিণ্ড পাবো না কোনদিন,' বলে উঠলো টিনের কাঠুরে।

'আমিও কোনদিন আর এম কাকী আর হেনরি কাকাকে দেখতে পাবো না,' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ডরোথি।

'সাবধান !' সবুজ মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠলো, 'তোমার সবুজ সিল্কের গাউনে চোখের জল পড়লে দাগ হয়ে যাবে।'

চোখ মুছে ফেললো ডরোথি। বললো, 'মনে হচ্ছে চেষ্টা না করে আমাদের উপায় নেই। কিন্তু আমি তো কাউকে মারতে চাই না— এম কাকীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যেও না।'

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে,' সিংহ বললো। 'তবে আমার মতো কাপুরুষের পক্ষে কি আর ডাইনীবধ সম্ভব হবে।'

'আমিও যাবো,' ঘোষণা করলো কাকতাড়ুয়া, 'তবে বোকার হদ্দ আমি, তোমার খুব একটা কাজে আসবো বলে মনে হয় না।'

'আমার হৃৎপিণ্ড নেই—কাউকে আঘাত করার কথা আমি ভাবতে পারি না, ডাইনী হলেও না,' টিনের কাঠুরে বলে উঠলো। 'তবে তোমরা সবাই যদি যাও, আমিও অবশ্যই যাবো তোমাদের সঙ্গে।'

কাজেই স্থির হলো, পরদিন সকালে সবাই যাত্রা শুরু করবে। টিনের কাঠুরে সবুজ একটা শানপাথরে ঘষে তার কুড়ুল শান দিয়ে নিলো, শরীরের গাঁটগুলোতে তেল দিলো ভালো করে। কাকতাড়ুয়া শরীরে নতুন খড় পুরে নিলো। তার চোখদু'টো রঙ দিয়ে নতুন করে এঁকে দিলো ডরোথি যাতে সে ভালোভাবে দেখতে পায়। সবুজ মেয়েটা ভারী ভালোবেসে ফেলেছে ওদের। নানা সুখাদ্য দিয়ে ডরোথির ঝুড়ি ভর্তি করে দিলো সে, সবুজ ফিতে দিয়ে টোটোর গলায় ছোট্ট একটা ঘণ্টা বেঁধে দিলো।

সকাল সকাল ঘুমুতে গেল সবাই।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের পেছনের আঙিনায় একটা সবুজ মোরগ ডেকে উঠলো, আর সবুজ একটা ডিম পেড়ে কঁক্‌কঁক্ করতে থাকলো একটা মুরগী। তাই শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওদের।

www.boiRboi.blogspot.com

বারো

সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিক ওদের সঙ্গে নিয়ে পান্নানগরীর নানা রাস্তা ঘুরে আবার নগররক্ষীর ঘরে এসে হাজির হলো। নগররক্ষী তার গলায় ঝোলানো ছোট্ট চাবি দিয়ে সবার চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে সেগুলো আবার বড়ো বাক্সটায় পুরে রাখলো আগের মতো। তারপর বিনীতভাবে নগরতোরণ খুলে ধরলো।

'পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনীর রাজ্যে যেতে হয় কোন্ রাস্তা দিয়ে?' জানতে চাইলো ডরোথি।

'কোনো রাস্তা নেই,' উত্তর দিলো নগররক্ষী। 'কেউ কোনদিন ওদিকে যেতে চায় না।'

'তাহলে তাকে কী করে খুঁজে পাবো আমরা?' আবার বললো ডরোথি।

'তা খুব সহজেই পাবে,' নগররক্ষী জবাব দিলো। 'একবার যদি ডাইনী জানতে পায় তোমরা উইঙ্কিদের দেশে পা দিয়েছো, সে-ই তোমাদের খুঁজে নেবে—সবাইকে দাস বানিয়ে রাখবে।'

'তা পারবে না বোধ হয়,' বললো কাকতাড়ুয়া, 'কারণ আমরা তো যাচ্ছি তাকে ধ্বংস করতে।'

'ও আচ্ছা, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা,' নগররক্ষী বললো।

www.boiRboi.blogspot.com

'এ-পর্যন্ত তো কেউ কোনদিন তাকে ধ্বংস করতে পারেনি, তাই ভাবছিলাম সে তোমাদের দাস বানিয়ে রাখবে—সবাইকে তা-ই করেছে এর আগে। তবে খুব সাবধানে থেকো, ভারী শয়তান আর হিংস্র ওই ডাইনী, তাকে ধ্বংস করা সম্ভব না-ও হতে পারে। যাই হোক, সোজা পশ্চিম বরাবর হাঁটতে থাকো—সূর্য অস্ত যায় যেদিকে—তাকে পাবেই পাবে।'

সৈনিককে ধন্যবাদ জানালো ওরা, তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিমদিকে যাত্রা করলো।

নরম ঘাসে ঢাকা মাঠ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে চলেছে অভিযাত্রীদল। এখানে ওখানে ফুটে আছে থোকা থোকা ডেইজি আর বাটারকাপ। প্রাসাদে থাকতে ডরোথি সিল্কের যে সুন্দর পোশাকটা পরেছিল, এখনও সেটাই প'রে আছে। তবে অবাক হয়ে লক্ষ্য করছে সে, পোশাকটা এখন আর সবুজ দেখাচ্ছে না, ধপধপে শাদা মনে হচ্ছে। টোটোর গলায় বাঁধা ফিতের রঙও আর সবুজ নেই, সেটাও শাদা দেখাচ্ছে ডরোথির পোশাকের মতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পান্নানগরী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এলো। যতোই এগোচ্ছে, পায়ের নিচের মাটি ততোই এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নিচু হয়ে উঠছে। পশ্চিমের এই রাজ্যে কোনো খেত-খামার ঘরবাড়ি নেই। শুধু পতিত জমি পড়ে আছে।

সূর্য ঢলে পড়ার পর কড়া রোদ এসে পড়লো ওদের মুখে। একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে তার ছায়ায় আশ্রয় নেবে। ফলে রাত নামার আগেই ডরোথি, টোটো আর সিংহ ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়লো। ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো তিনজন। কাঠুরে আর কাকতাড়ুয়া পাহারায় রইলো।

এদিকে পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনীর যদিও একটামাত্র চোখ, তবু সে-চোখ দুরবীনের মতোই শক্তিশালী। কিছুই ডাইনীর নজর এড়ায় না। নিজের প্রাসাদের দরজায় বসে সে চারদিক বহুদূর পর্যন্ত জরিপ করে নিচ্ছিলো। হঠাৎ ঘুমন্ত ডরোথি আর তার বন্ধুদের ওপর দৃষ্টি পড়লো তার। অনেক দূরে রয়েছে ওরা, তবু নিজের রাজ্যে অপরিচিত আগন্তুকদের দেখে ডাইনী ভয়ানক খেপে উঠলো। গলায় ঝোলানো রুপোর বাঁশি মুখে তুলে ফুঁ দিলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ডাইনীর কাছে ছুটে এলো একপাল প্রকাণ্ড নেকড়ে। লম্বা লম্বা পা সেগুলোর, জ্বলন্ত চোখ আর ধারালো দাঁত।

'ওই যে বিদেশীদের দেখছো, ওদের কাছে চলে যাও এক্ষুণি,' ডরোথিদের দেখিয়ে বললো ডাইনী, 'সবাইকে টুকরো টুকরো করে টেনে ছিঁড়ে ফেলো!'

'তোমার দাস বানিয়ে রাখবে না ওদের?' নেকড়ে-দলপতি জানতে চাইলো।

'না,' জবাব দিলো ডাইনী। 'ওদের একজন টিনের তৈরি, একজন তৈরি খড় দিয়ে; আর আছে একটা মেয়ে, আর একটা সিংহ। কেউ-ই কোনো কাজে আসবে না। কাজেই সবাইকে ছিঁড়ে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারো তোমরা।'

'খুব ভালো কথা,' ব'লে তীরের বেগে ছুটে চলে গেল নেকড়ে-সর্দার। অন্য নেকড়েগুলোও তার পেছনে ছুট দিলো।

ভাগ্য ভালো, বরাবরের মতোই কাকতাড়ুয়া আর কাঠুরে সম্পূর্ণ জেগে ছিলো। নেকড়ের দলের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো তারা।

'আমি লড়বো ওদের সঙ্গে,' বলে উঠলো কাঠুরে। 'আমার পেছনে আড়াল নাও, ওরা এলে যা করার আমিই করবো।'

ধারালো কুড়ুল উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো টিনের কাঠুরে। নেকড়ে-দলপতি কাছে আসতেই সবেগে হাত নামিয়ে আনলো সে, এক কোপে সেটার ধড় থেকে মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল জানোয়ারটা। আবার কুড়ুল তুলতে না তুলতেই আরেকটা নেকড়ে এসে পড়লো, টিনের কাঠুরের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সেটাও মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হলো। চল্লিশটা নেকড়ে ছিলো সবসুদ্ধ, কুড়ুলের চল্লিশ ঘায়ে একে একে সবগুলো মারা পড়লো। দেখতে দেখতে কাঠুরের সামনে জমে উঠলো মৃতদেহের প্রকাণ্ড স্তূপ।

কুড়ুল নামিয়ে রাখলো টিনের কাঠুরে। তারপর কাকতাড়ুয়ার পাশে বসে পড়লো।

'দারুণ লড়েছো, বন্ধু,' বললো কাকতাড়ুয়া।

অপেক্ষা করতে লাগলো দু'জন। রাত কেটে গেল। সকালে ঘুম ভাঙলো ডরোথির। নেকড়ের পালের লোমশ মৃতদেহের প্রকাণ্ড স্তূপ দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। টিনের কাঠুরে সবকিছু খুলে বললো তাকে। সবার জীবন বাঁচিয়েছে বলে ডরোথি কাঠুরেকে অনেক ধন্যবাদ জানালো।

নাশতা সেরে নিলো ডরোথি। তারপর সবাই মিলে আবার যাত্রা শুরু করলো।

ওদিকে সকাল হতেই ডাইনী আবার তার প্রাসাদের দরজায় এসে দাঁড়ালো। এক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরলো দূরে। অবাক হয়ে দেখলো, তার সমস্ত নেকড়ে মরে পড়ে আছে, আর আগন্তুকের দল এখনও এগিয়ে আসছে তার রাজ্যের ভেতর দিয়ে। সাংঘাতিক রেগে গেল সে। রুপোর বাঁশি মুখে তুলে দু'বার ফুঁ দিলো।

www.boiRboi.blogspot.com

অমনি বুনো কাকের এক বিশাল ঝাঁক উড়ে এলো ডাইনীর প্রাসাদের দিকে। আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো।

কাকের রাজার উদ্দেশে বললো ডাইনী, 'এক্ষুণি উড়ে যাও ওই আগন্তুকদের কাছে; ঠুকরে চোখ তুলে নাও ওদের, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলো সবাইকে!'

বুনো কাকের দল তৎক্ষণাৎ বিশাল ঝাঁক বেঁধে ডরোথি আর তার সঙ্গীদের দিকে উড়ে চললো।

কাকের ঝাঁক আসতে দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল ডরোথি। কিন্তু কাকতাড়ুয়া বললো:

'এবার আমার লড়াইয়ের পালা। আমার পাশে মাটিতে শুয়ে পড়ো তোমরা সবাই—কোনো ভয় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে ওরা শুয়ে পড়লো মাটিতে। শুধু একা কাকতাড়ুয়া দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কাকতাড়ুয়া দেখলে সবসময়ই কাকেরা ভয় পায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কাকের ঝাঁক উড়ে এসে কাকতাড়ুয়াকে দেখে ভয় পেয়ে গেল, বেশি কাছে আসার সাহস পেলো না। কিন্তু কাকের রাজা বলে উঠলো:

'এ তো দেখছি খড়পোরা একটা মানুষের মূর্তি শুধু। ওর চোখ ঠুকরে তুলে নিচ্ছি আমি, দাঁড়াও।'

কাকতাড়ুয়াকে লক্ষ্য করে ছোঁ মারলো কাকের রাজা। অমনি খপ্‌ করে তার মাথা চেপে ধরলো কাকতাড়ুয়া, ঘাড় মুচড়ে তাকে মেরে ফেললো। আরেকটা কাক ছোঁ মারলো, সেটারও ঘাড় মুচড়ে দিলো কাকতাড়ুয়া। চল্লিশটা কাক ছিলো দলে, এক এক করে সে চল্লিশটারই ঘাড় মটকে দিলো। একসময় দেখা গেল, সমস্ত কাক

মরে পড়ে আছে তার পাশে।

সঙ্গীদের উঠে পড়তে বললো কাকতাড়ুয়া। সবাই মিলে আবার যাত্রা শুরু করলো।

দুষ্ট ডাইনী যখন আবার দূরে তাকিয়ে দেখলো, তার সমস্ত কাক মরে পড়ে আছে, রেগে আগুন হয়ে গেল সে। রুপোর বাঁশি মুখে তুলে পরপর তিনবার ফুঁ দিলো এবার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রবল গুঞ্জন শোনা গেল আকাশে, কালো মৌমাছির বিশাল এক ঝাঁক ডাইনীর কাছে উড়ে এলো।

'অচেনা ওই বিদেশীদের ওপর গিয়ে চড়াও হও তোমরা,' ডাইনী আদেশ করলো, 'হুল ফুটিয়ে খতম করো ওদের!'

মৌমাছির ঝাঁক বাঁক নিয়ে দ্রুত উড়ে চললো ডরোথি আর তার বন্ধুদের দিকে।

কিন্তু শত্রু কাছে আসবার আগেই টিনের কাঠুরে তাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেল। কাকতাড়ুয়াও যা করণীয় স্থির করে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে।

'আমার শরীর থেকে খড় বের করে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডরোথি, টোটো আর সিংহকে ঢেকে দাও,' কাঠুরের উদ্দেশে বললো কাকতাড়ুয়া, 'তাহলে আর মৌমাছিরা ওদের হুল ফোটাতে পারবে না।'

তা-ই করলো কাঠুরে। টোটোকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ডরোথি সিংহের কাছ ঘেঁষে শুয়ে রইলো। খড়ের নিচে পুরো ঢাকা পড়ে রইলো ওদের শরীর।

মৌমাছিরা কাছে এসে একমাত্র কাঠুরে ছাড়া হুল ফোটাবার মতো আর কাউকে দেখতে পেলো না। তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝাঁক বেঁধে। কাঠুরের তাতে আদৌ কিছু হলো না, উল্টো টিনের

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গে ঘা খাওয়ার ফলে সব মৌমাছির হুল ভেঙে গেল। হুল ভেঙে গেলে মৌমাছি বাঁচে না—কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মৌমাছির ঝাঁকের দফা রফা হয়ে গেল। কাঠুরের চারপাশে অসংখ্য মৌমাছির মৃতদেহ মিহি কয়লার গুঁড়োর ছোট ছোট গাদার মতো ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে রইলো।

ডরোথি আর সিংহ উঠে দাঁড়ালো। কাকতাড়ুয়ার শরীরে আবার খড় পুরে দিলো টিনের কাঠুরে, ডরোথি তাকে সাহায্য করলো। ফের আগের মতো হয়ে উঠলো কাকতাড়ুয়া। আবার ওরা দল বেঁধে রওনা হলো।

ডাইনী যখন দেখলো, তার কালো মৌমাছির ঝাঁক কয়লার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে, প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ হয়ে গেল সে। জোরে জোরে পা ঠুকতে লাগলো মাটিতে, নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলো, দাঁতে দাঁত পিষতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত বারোজন দাসকে তলব করলো সে। সবাই তারা উইঙ্কি। তাদের প্রত্যেকের হাতে ধারালো বর্শা তুলে দিয়ে বিদেশী আগন্তুকদের খতম করে আসতে নির্দেশ দিলো।

উইঙ্কিরা তেমন সাহসী নয়, কিন্তু ডাইনীর হুকুমমতো কাজ করতে বাধ্য তারা। কাজেই দ্রুত পা চালিয়ে তারা ডরোথিদের সন্ধানে রওনা হয়ে গেল।

উইঙ্কিরা কাছে আসতেই সিংহ ভীষণ এক হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়লো তাদের সামনে। ভয়ে আঁতকে উঠলো বেচারীরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো।

তারা প্রাসাদে ফিরে এলে দুষ্ট ডাইনী আচ্ছামতো চাবকালো তাদের, তারপর যার যার কাজে পাঠিয়ে দিলো।

কী করা যায় এরপর, ভাবতে বসলো ডাইনী। বিদেশীদের নিশ্চিহ্ন করার এতগুলো পরিকল্পনা কী করে ব্যর্থ হয়ে গেল, সে ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু যেমন ক্ষমতাধর সে, তেমনি ক্রূর। অচিরেই সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

ডাইনীর আলমারিতে আছে একটা সোনার মুকুট। মুকুটের চারপাশ ঘিরে বসানো রয়েছে একসার হীরা আর চুনি। এই সোনার মুকুটের একটা বিশেষ জাদুর ক্ষমতা আছে। যার কাছে থাকবে এই মুকুট, সে তিনবার উড়ুক্কু বানরদের তলব করতে পারবে; সে যে-আদেশ দেবে বানরদের, তারা তা-ই পালন করবে। তবে তিনবারের বেশি কেউ এই আজব প্রাণীদের হুকুম করতে পারবে না। দুষ্ট ডাইনী এর আগে দু'বার এই মুকুটের জাদু ব্যবহার করেছে। প্রথমবার ব্যবহার করেছে উইঙ্কিদের দাস বানিয়ে দেশের শাসক হিসেবে জেঁকে বসার সময়। সে-সময় কাজটাতে উড়ুক্কু বানরের দলই তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয়বার মুকুটটা ব্যবহার করেছিল খোদ মহাশক্তিমান ওজের সঙ্গে তার লড়াইয়ের সময়। উড়ুক্কু বানরদের সাহায্য নিয়ে সেবার পশ্চিমরাজ্য থেকে ওজকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

এখন ডাইনী আর মাত্র একবার সোনার মুকুটের জাদু কাজে লাগাতে পারবে। সেজন্যে অন্যান্য ক্ষমতা হাতে থাকতে সে মুকুটটা ব্যবহার করতে চায়নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, তার হিংস্র নেকড়ের পাল, তার বুনো কাকের দল, হুল-ফোটানো মৌমাছির ঝাঁক—সব খতম হয়ে গেছে; তার দাসদের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে ভীরু সিংহ। কাজেই বুঝতে পারছে সে, ডরোথি আর তার বন্ধুদের ধ্বংস করার আর মাত্র এই একটা পথই খোলা রয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

আলমারি খুলে সোনার মুকুটটা বের করলো ডাইনী। সেটা প'রে নিলো মাথায়। তারপর বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললো :

'এপ্-পি, পেপ্-পি, কাক্-কি!'

এরপর ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলো :

'হিল্-লো, হল্-লো, হেল্-লো!'

সবশেষে ছু'পায়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো :

'জিজ্-জি, জুজ্-জি, জিক্!'

এবার মুকুটের জাছুর কাজ শুরু হলো। আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো, চাপা গুড়্গুড়্ ধ্বনি উঠলো বাতাসে। অসংখ্য ডানার ঝট্পট্ আওয়াজ ভেসে এলো, সেইসঙ্গে শোনা গেল বহু কণ্ঠের বিকট কিচিরমিচির কলরব আর হাসির শব্দ।

অন্ধকার আকাশ ফুঁড়ে সূর্য উঁকি দিতেই দেখা গেল, ছুষ্ট ডাইনীকে ঘিরে রয়েছে বিশাল এক বানরবাহিনী। প্রত্যেক বানরের কাঁধে একজোড়া করে প্রকাণ্ড আকারের শক্তিশালী পাখা।

অন্যগুলোর চেয়ে একটা বানর আকারে অনেক বড়ো। বানরদের সর্দার সে। উড়ে ডাইনীর একেবারে কাছে গিয়ে সে বললো :

'এই নিয়ে তিনবার, অর্থাৎ, শেষবারের মতো ডেকেছো তুমি আমাদের। কী হুকুম?'

'যে-বিদেশী আগন্তুকের দল ঢুকেছে আমার রাজ্যে, তাদের কাছে চলে যাও,' বললো ছুষ্ট ডাইনী, 'শুধু সিংহ ছাড়া আর সবাইকে শেষ করে দাও। জানোয়ারটাকে ধরে নিয়ে আসবে আমার কাছে, ঘোড়ার মতো লাগাম পরিয়ে ওকে দিয়ে কাজ করাবো বলে ঠিক করেছি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমার হুকুম এখুনি তামিল করা হবে,' বললো বানরসর্দার।

বিকট রবে হৈ-হল্লা কিচিরমিচির করতে করতে উড়ুক্কু বানরের দল উড়ে চলে গেল।

ডরোথি আর তার বন্ধুরা আগের মতোই হেঁটে চলছিল। বানর-বাহিনী আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। কয়েকটা বানর টিনের কাঠুরেকে আঁকড়ে ধরে শূন্যে তুলে উড়িয়ে নিয়ে চললো। এবড়োখেবড়ো ধারালো পাথরের চাঁইয়ে ভর্তি একটা এলাকার ওপর নিয়ে গিয়ে বেচারাকে ছেড়ে দিলো তারা। অনেক ওপর থেকে পাথরের ওপর আছড়ে পড়লো টিনের কাঠুরে। তারপর সেখানেই বাঁকাচোরা তোবড়ানো অবস্থায় পড়ে রইলো। নড়াচড়া এমনকি গোঙানোর শক্তিটুকু পর্যন্ত তার রইলো না।

আরেক দল বানর পাকড়াও করলো কাকতাড়ুয়াকে। লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে তারা কাকতাড়ুয়ার পোশাকের ভেতর থেকে, মাথার ভেতর থেকে সমস্ত খড় টেনে বের করে ফেললো। তারপর তার টুপি, জুতো আর কাপড়চোপড় একসঙ্গে করে একটা পুঁটুলি বানিয়ে লম্বা একটা গাছের মগডালে ছুঁড়ে দিলো।

বাকি বানরেরা সিংহকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো শক্ত দড়ি দিয়ে। গোছার পর গোছা দড়ি তার ধড়, মাথা আর পায়ের চারপাশে পেঁচিয়ে এমন করে বাঁধলো যে কামড়াবার কিংবা আঁচড়াবার কিংবা ধস্তাধস্তি করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা বেচারার রইলো না। সে-অবস্থায় তাকে মাটি থেকে তুলে শূন্যের ভেতর দিয়ে উড়িয়ে ডাইনীর প্রাসাদে নিয়ে এলো উড়ুক্কু বানরেরা। সেখানে উঁচু লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট একটা চত্বরে তাকে আটকে রাখা হলো। পালাবার কোনো উপায় রইলো না সিংহের।

কিন্তু বানরের দল ডরোথির বিন্দুমাত্র ক্ষতি করলো না। টোটোকে কোলে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বন্ধুদের দুর্দশা দেখছিল। ভাবছিল, এর পরই আসছে তার পালা। এমন সময় উড়ুক্কু বানরের সর্দার উড়ে এলো তার দিকে—লম্বা লোমশ দু'হাত সামনে বাড়ানো, কুৎসিত মুখে ভয়াল হাসি। কিন্তু ডরোথির কপালে উত্তররাজ্যের শুভার্থী মায়াবিনীর চুমুর ছাপ চোখে পড়তেই থমকে থেমে পড়লো সে, ইশারায় দলের অন্যসব বানরকেও ডরোথিকে স্পর্শ করতে নিষেধ করলো।

'এই ছোট মেয়েটার কোনো ক্ষতি আমরা করতে পারবো না,' সঙ্গী বানরদের উদ্দেশে বললো সে, 'কারণ শুভ শক্তির প্রহরায় রয়েছে সে—এবং শুভ শক্তির ক্ষমতা অশুভ শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। আমরা বড়জোর ওকে ডাইনীর প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতে পারি।'

খুব সাবধানে আলগোছে ডরোথিকে ধরে শূন্যে তুলে নিলো তারা, আকাশপথে দ্রুত উড়িয়ে নিয়ে প্রাসাদে এসে হাজির হলো, তারপর তাকে নামিয়ে দিলো সদর দরজার সামনে। বানরসর্দার ডাইনীকে বললো:

'আমাদের যতদুর সাধ্য, তোমার হুকুম তামিল করেছি। টিনের কাঠুরে আর কাকতাড়ুয়াকে ধ্বংস করেছি, সিংহকে বেঁধে রেখেছি প্রাসাদের চত্বরে। ছোট মেয়েটা আর তার কোলের কুকুরটার কোনো ক্ষতি করার সাহস আমাদের নেই। এবার বিদায় নিচ্ছি আমরা। উড়ুক্কু বানরদের তলব করার আর কোনো অধিকার তোমার থাকছে না। আর কখনো তুমি আমাদের দেখা পাবে না।'

হাসতে হাসতে, কিচিরমিচির কোলাহল করতে করতে দল বেঁধে

www.boiRboi.blogspot.com

উড়ে চলে গেল উড়ুক্কু বানরেরা—কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

ডরোথির কপালের ছাপ দেখে দুষ্ট ডাইনী যেমন অবাক হলো, তেমনি শঙ্কিত হয়ে উঠলো মনে মনে। সে ভালো করেই জানে, ডরোথির বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ক্ষমতা উড়ুক্কু বানরদের নেই, তারও নেই। ডরোথির পায়ের দিকে চাইলো সে। রুপোর জুতোজোড়া দেখতে পেয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো। কারণ কী অদ্ভুত ক্ষমতা ওই জুতোর, সে জানে। প্রথমে তার ইচ্ছে হলো, এক দৌড়ে ডরোথির সামনে থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ডরোথির চোখের দিকে তাকিয়ে সে পরিষ্কার বুঝতে পারলো, নিতান্তই সহজ-সাধারণ ছোট্ট মেয়েটা—ওই রুপোর জুতোর কী আশ্চর্য ক্ষমতা তা ওর জানা নেই। মনে মনে হাসলো ডাইনী। ভাবলো, 'মারতে না পারলেও ওকে দাসী বানিয়ে রাখতে পারবো ঠিকই। কারণ ও জানে না, কী করে ওই জুতোর ক্ষমতা কাজে লাগাতে হয়।'

কর্কশ কঠোর স্বরে ডরোথিকে বললো সে:

'আয় আমার সঙ্গে। মনে থাকে যেন, আমি যা বলবো তা-ই করবি। তা না হলে টিনের কাঠুরে আর কাকতাড়ুয়ার মতো তোরও দফা রফা করে ছাড়বো।'

ডাইনীর পিছু পিছু প্রাসাদের অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কামরা পার হয়ে ডরোথি শেষপর্যন্ত রান্নাঘরে এসে পৌঁছুলো। ডাইনী হুকুম করলো, বাসনকোসন-কেটলি পরিষ্কার করতে হবে, মেঝে ঝাড়ু দিতে হবে, চুল্লিতে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলে রাখতে হবে।

নীরবে কাজ করতে শুরু করলো ডরোথি। মনে মনে ঠিক করেছে সে, যতদুর সাধ্য পরিশ্রম করবে, কারণ ডাইনী যে তাকে মেরে

ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়নি সেটাই মস্ত স্বস্তির ব্যাপার।

ডরোথি যখন খেটে মরছে, দুষ্ট ডাইনী ঠিক করলো, চত্বরে গিয়ে ভীরু সিংহকে ঘোড়ার মতো লাগাম পরিয়ে নেবে। দারুণ মজার হবে জিনিসটা, ভাবছে সে—যখনই বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হবে, সিংহকে দিয়ে তার রথ টানাবে।

কিন্তু যেইমাত্র চত্বরের দরজা খুলেছে ডাইনী, অমনি প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে হিংস্র ভঙ্গিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল সিংহ। একছুটে চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে তাড়াতাড়ি আবার দরজা বন্ধ করে দিলো।

'তোকে লাগাম পরাতে না-হয় না-ই পারলাম,' দরজার শিকের ভেতর দিয়ে চেয়ে সিংহকে বললো ডাইনী, 'উপোস করিয়ে রাখতে তো পারবো। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার কথামতো কাজ করবি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই খেতে পাবি না।'

বন্দী সিংহকে অনাহারে রাখলো ডাইনী। কিছুই খেতে দেয় না তাকে, শুধু প্রতিদিন দুপুরে এসে বন্ধ দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ঘোড়ার মতো লাগাম পরাবো তোকে—রাজি আছিস্?'

সিংহ উত্তর দেয়, 'না। এই চত্বরে ঢোকো যদি, তোমাকে আমি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবো।'

ডাইনীর কাছে যে সিংহকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে না, তার কারণ, প্রত্যেকদিন রাতে ডাইনী যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ডরোথি চুপি চুপি আলমারি থেকে খাবার এনে তাকে খেতে দেয়। খাওয়া শেষ হলে খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ে সিংহ। তার নরম ঝাঁকড়া কেশরের ওপর মাথা রেখে ডরোথিও তার পাশে শুয়ে পড়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

নিজেদের দুর্দশার কথা আলাপ করে দু'জন, কী করে পালানো যায় তা-ই নিয়ে পরামর্শ করে। কিন্তু প্রাসাদ থেকে বেরোবার কোনো উপায় ওরা খুঁজে পায় না। কারণ হলদে-রঙা উইঙ্কিরা দিন-রাত পাহারা দেয় প্রাসাদ। দুষ্ট ডাইনীর দাস তারা, ডাইনীর আদেশ অমান্য করার সাহস তাদের নেই।

সারাদিন ডরোথি হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। তবু ডাইনী শাসায় তাকে। ডাইনীর হাতে সবসময় একটা পুরনো ছাতা থাকে, প্রায়ই সে সেটা দিয়ে ডরোথিকে মারবে বলে ভয় দেখায়। কিন্তু আসলে ডরোথির কপালের ওই ছাপের জন্যে তার গায়ে হাত তোলার সাহস ডাইনীর নেই। ডরোথি সে-কথা জানে না, সেজন্যে খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। টোটোর জন্যেও তার খুব ভয় হয়। একদিন ডাইনী ছাতা দিয়ে মেরেছিল টোটোকে। কী সাহস ছোট্ট কুকুরটার, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ডাইনীর পায়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, টোটোর কামড়ে ডাইনীর পা থেকে একটুও রক্ত বেরোয়নি। কারণ এমন ঘোর শয়তান সে যে বহু বছর আগেই তার শরীরের রক্ত শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

খুব মুষড়ে পড়েছে ডরোথি। সে জানে, ক্যানসাসে এম কাকীর কাছে ফিরে যাওয়া এখন আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকুল হয়ে কাঁদে সে। টোটো তার পায়ের কাছে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে একটানা কুঁইকুঁই করতে থাকে; বোঝাতে চেষ্টা করে, ছোট্ট মনিবের দুঃখে সে-ও কতো দুঃখ বোধ করছে। ক্যানসাসে আছে সে, না ওজের দেশে আছে, তা নিয়ে আসলে টোটোর কোনো মাথাব্যথা নেই—ডরোথির সঙ্গে থাকতে পারলেই সে খুশি। কিন্তু ছোট্ট

মেয়েটা খুব কষ্টে আছে, বুঝতে পারে সে; সেজন্যে তারও খুব কষ্ট হয়।

এদিকে ডরোথির পায়ের রুপোর জুতোজোড়া হাতিয়ে নেয়ার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে অত্যাচারী ডাইনী। তার মৌমাছির দল, কাকের ঝাঁক, নেকড়ের পাল মরে পড়ে আছে গাদা হয়ে, রোদে শুকিয়ে নিঃশেষ হচ্ছে। সোনার মুকুটের সমস্ত ক্ষমতাও সে ব্যবহার করে ফেলেছে। কিন্তু যদি রুপোর জুতোজোড়া শুধু সে হাতে পায়, তাহলে অন্য যে-সব জিনিস সে হারিয়েছে সেগুলোর সমস্ত ক্ষমতার চেয়েও বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেতে পারবে সে অনায়াসে।

খুব সাবধানে ডরোথির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে ডাইনী। যদি কখনো ডরোথি পা থেকে জুতো খোলে তাহলে সে হয়তো চুরি করে নিতে পারবে—এই তার মতলব। কিন্তু সুন্দর জুতোজোড়া ডরোথির এমন গর্বের ধন যে রাতে স্নান করার সময়টুকু ছাড়া আর কখনো ভুলেও সেগুলো পা থেকে খোলে না। অন্ধকারকে সাংঘাতিক ভয় পায় ডাইনী, রাতের বেলা জুতো চুরি করার জন্যে ডরোথির ঘরে ঢোকার সাহস তার নেই। আবার অন্ধকারকে সে যতখানি ভয় পায় তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পায় পানিকে; সেজন্যে ডরোথির স্নানের সময়ও সে কক্ষনো কাছে ভেড়ে না। আসলে বুড়ি ডাইনী কখনো পানি স্পর্শ করে না, কখনো কোনভাবে গায়ে পানির ছোঁয়া লাগতেও দেয় না।

কিন্তু শয়তান বুড়ি বড্ড ধূর্ত। ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত সে ঠিকই এক ফন্দি বের করলো। রান্নাঘরের মেঝের মাঝখানে লোহার একটা দণ্ড আড়াআড়িভাবে পেতে রাখলো সে। তারপর জাদুর বলে

www.boiRboi.blogspot.com

সেটাকে মানুষের চোখে অদৃশ্য করে দিলো। ফলে যা হবার তা-ই হলো। মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ডরোথি দণ্ডটা চোখে দেখতে না পেয়ে সেটার ওপর হোঁচট খেয়ে সটান আছড়ে পড়লো। তেমন একটা চোট পেলো না বটে, কিন্তু তার পা থেকে একপাটি জুতো খসে গেল। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিতে গেল জুতোটা, কিন্তু ও সেটার নাগাল পাবার আগেই ডাইনী ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের হাড্ডিসার পায়ে প'রে ফেললো।

ফন্দি কাজে আসায় দারুণ খুশি হয়ে উঠলো শয়তান বুড়ি। এক-পাটি জুতো যতক্ষণ তার অধিকারে থাকছে, রুপোর জুতোর জাদুর ক্ষমতার অর্ধেকও ততক্ষণ হাতে থাকছে তার। তাছাড়া এ-অবস্থায় ডরোথিও সে-জাদু তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না—জাদু ব্যবহারের কৌশল যদি মেয়েটার জানা থাকেও।

সুন্দর জুতোর একপাটি বেদখল হয়ে গেছে দেখে ডরোথির ভীষণ রাগ হলো। 'আমার জুতো ফেরত দাও।' বললো সে ডাইনীকে।

'দেবো না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো ডাইনী, 'কারণ এ-জুতো আমার এখন—তোর নয়।'

'আস্ত শয়তান তুমি একটা!' ডরোথি চেঁচিয়ে উঠলো। 'এভাবে আমার জুতো হাতিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই।'

'সে যা-ই বলিস, এ-জুতো আমি দিচ্ছি না,' ক্রূর হেসে বললো ডাইনী। 'একদিন আরেক পাটিও নিয়ে নেবো দেখিস!'

ভয়ানক চটে উঠলো ডরোথি তার কথা শুনে। কাছেই এক বালতি পানি ছিলো। ঝট্ করে বালতিটা তুলে নিয়ে ডাইনীর গায়ের ওপর সবটুকু পানি ছুঁড়ে দিলো সে। ডাইনীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত স্বরে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠলো বুড়ি। স্তম্ভিত ডরোথি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখলো, ডাইনী চুপসে ছোট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, নরম হয়ে গলে পড়ছে।

'এ কী সর্বনাশ করলি তুই!' আর্তনাদ করে উঠলো বুড়ি। 'এখুনি যে আমি গ'লে শেষ হয়ে যাবো!'

'হায়, হায়, তাই নাকি!' বলে উঠলো বিমূঢ় ডরোথি। তার চোখের সামনে ডাইনী সত্যি সত্যি গ'লে যাচ্ছে দেখে সে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেছে।

'তুই জানতি না, পানির ছোঁয়া লাগলেই আমি শেষ হয়ে যাবো?' কাতর আর্তনাদের সুরে বললো ডাইনী।

'মোটেই না,' ডরোথি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো। 'কী করে জানবো?'

'তাহলে শোন্, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি গ'লে একেবারে শেষ হয়ে যাবো, তখন তুই-ই হবি এই প্রাসাদের মালিক। জীবনে অনেক অন্যায়-অত্যাচার করেছি, কিন্তু কোনদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি তোর মতো একটা পুঁচকে মেয়ে আমাকে গলিয়ে ফেলে আমার সব দুষ্কর্মের অবসান ঘটাবে একদিন। এই দ্যাখ—আমি মিলিয়ে যাচ্ছি!' বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল ডাইনী। তার পুরো শরীর গ'লে গিয়ে বাদামী রঙের আকৃতিহীন একটা তরল পদার্থে পরিণত হয়ে রান্নাঘরের পরিচ্ছন্ন মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।

ডাইনী সত্যি সত্যি নেই হয়ে গেছে দেখে ডরোথি আরেক বালতি পানি এনে মেঝের সেই গলিত জঞ্জালের ওপর ঢেলে দিলো। তারপর ঝাড়ু দিয়ে সব বের করে দিলো দরজার বাইরে।

ডাইনীর পায়ের রুপোর জুতোখানা শুধু পড়ে আছে। সেটা তুলে

www.boiRboi.blogspot.com

নিয়ে ধুয়ে ফেললো ডরোথি। কাপড় দিয়ে মুছে আবার নিজের পায়ে প'রে নিলো।

অবশেষে মুক্তি পেয়েছে ও। এখন যা খুশি তা ই করতে পারে। এক দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চত্বরের দিকে ছুটলো। সিংহকে বলবে; পশ্চিমরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীর অস্তিত্ব নেই আর—তারাও আর বন্দী হয়ে নেই অজানা-অচেনা দেশের শত্রুপুরীতে।

তেরো

এক বালতি পানিতে ভিজে অত্যাচারী ডাইনী গ'লে অদৃশ্য হয়ে গেছে শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো ভীরু সিংহ। ডরোথি তখুনি চত্বরের দরজা খুলে তাকে মুক্ত করে দিলো।

প্রাসাদে ঢুকলো দু'জন। প্রথমেই ডরোথি সমস্ত উইঙ্কিকে এক জায়গায় জড়ো করে জানিয়ে দিলো, চিরকালের মতো তাদের দাসত্বের অবসান হয়েছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো হলদে উইঙ্কির দল। দুষ্ট ডাইনীর খপ্পরে পড়ে বহু বছর ধরে তাদের হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে। সবসময় ডাইনী তাদের প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আচরণ করে এসেছে। আজকের দিনটা তাই তারা উৎসবের দিন বলে গণ্য করবে বলে ঠিক করলো। পান-ভোজন এবং নাচ-গানে মেতে উঠলো সবাই।

'আমাদের বন্ধু কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরে যদি শুধু আজ থাকতো আমাদের সঙ্গে,' বললো সিংহ, 'কতোই না আনন্দ হতো তাহলে।'

'তোমার মনে হয় না, আমরা ওদের উদ্ধার করতে পারবো?' ডরোথি ব্যগ্র কণ্ঠে বললো।

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' জবাব দিলো সিংহ।

www.boiRboi.blogspot.com

হলদে উইঙ্কিদের ডাকলো ওরা। জানতে চাইলো, ওদের বন্ধুদের উদ্ধার করার ব্যাপারে তারা সাহায্য করতে রাজি আছে কিনা। উইঙ্কিরা বললো, তাদের সাধ্যে যতোটা কুলোয় তারা সানন্দে করবে ডরোথির জন্যে, কারণ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে ডরোথিই তাদের মুক্ত করেছে।

বিচক্ষণ কিছু উইঙ্কিকে বেছে নিলো ডরোথি। তারপর সবাই মিলে যাত্রা শুরু করলো। সারাদিন এবং পরের দিনেরও অনেকটা সময় পথ চলার পর অবশেষে ওরা পাহাড়ী এলাকায় বাঁকাচোরা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকা টিনের কাঠুরের কাছে এসে হাজির হলো। কাঠুরের পাশেই তার কুড়ুল পড়ে আছে। তবে মরচে ধরে গেছে সেটার ফলায়, হাতলটাও ভেঙে খাটো হয়ে গেছে।

উইঙ্কিরা যত্নের সঙ্গে ধরাধরি করে কাঠুরেকে তুলে নিলো। তারপর আবার সবাই রওনা হলো ডাইনীর পীত প্রাসাদের পথে। পুরনো বন্ধুর দুর্দশা দেখে পথে কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করলো ডরোথি। সিংহের মুখও খুব থমথমে, বিষণ্ণ।

প্রাসাদে পৌঁছে ডরোথি উইঙ্কিদের বললো:

'তোমাদের লোকজনের মধ্যে টিন-মিস্ত্রি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে,' উইঙ্কিরা জবাব দিলো, 'খুব পাকা মিস্ত্রিও আছে কয়েকজন।'

'তাহলে তাদের ডেকে নিয়ে এসো আমার কাছে,' বললো ডরোথি।

ঝুড়িভর্তি যন্ত্রপাতি নিয়ে টিন-মিস্ত্রিরা হাজির হলে ডরোথি তাদের বললো, 'টিনের কাঠুরের শরীরের সমস্ত টোল মেরামত করতে হবে, বেঁকে যাওয়া জায়গাগুলো সোজা করে আবার আগের অবস্থায়

ফিরিয়ে আনতে হবে, ভাঙা জায়গাগুলো ঝালাই করে জুড়ে দিতে হবে। পারবে তোমরা?'

টিন-মিস্ত্রিরা কাঠুরের ভাঙাচোরা তোবড়ানো শরীর ভালো করে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখলো। তারপর বললো, তাদের বিশ্বাস, মেরামত করে কাঠুরের চেহারা আবার আগের মতো করে দিতে পারবে তারা।

প্রাসাদের একটা বড়োসড়ো হলদে কামরায় মিস্ত্রির দল কাজ শুরু করলো। তিন দিন চার রাত ধরে কাজ চললো। টিনের কাঠুরের হাত, পা, ধড়, মাথা সব পিটিয়ে, মুচড়ে, বাঁকিয়ে, ঝালাই করে, ঘষে-মেজে, ঠুকে শেষ পর্যন্ত মিস্ত্রিরা তাকে আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো। দেখা গেল, কাঠুরের শরীরের জোড়গুলোও ঠিক আগের মতোই ভালোভাবে কাজ করছে। গোটাকয়েক তালি পড়েছে অবশ্য শরীরের এখানে-ওখানে, কিন্তু কাজে কোনো খুঁত রাখেনি মিস্ত্রিরা। তাছাড়া মিথ্যে অহমিকা নেই টিনের কাঠুরের, তালির জন্যে সে মোটেই মন খারাপ করলো না।

ডরোথির কামরায় গিয়ে ঢুকলো টিনের কাঠুরে। তাকে উদ্ধার করার জন্যে ডরোথিকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালো। অসম্ভব ভালো লাগছে তার—চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। যাতে আবার জোড়গুলোতে মরচে ধরে না যায় সেজন্যে ডরোথি নিজের এপ্রনের কোণ দিয়ে কাঠুরের মুখ থেকে চোখের জলের প্রতিটি ফোঁটা সযত্নে মুছে দিতে লাগলো। একই সঙ্গে পুরনো বন্ধুকে আবার ফিরে পাবার আনন্দে তার চোখ দিয়েও অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে-জল অবশ্য মোছার দরকার হলো না। ওদিকে সিংহ লেজের ডগা দিয়ে এতো ঘন ঘন চোখ মুছছে যে একেবারে ভিজে

www.boiRboi.blogspot.com

গেল ডগাটা। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাকে চত্বরে গিয়ে লেজ রোদে উঁচিয়ে ধরে শুকিয়ে আসতে হলো।

ডরোথির কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে টিনের কাঠুরে বললো, 'কাকতাড়ুয়া থাকতো যদি শুধু আজ আমাদের সঙ্গে, সুখের আর সীমা থাকতো না।'

'তাকেও খুঁজে দেখবো আমরা, চলো,' বললো ডরোথি।

উইঙ্কিদের ডাকলো সে সাহায্যের জন্যে। সারাদিন এবং পরের দিনেরও অনেকটা সময় একনাগাড়ে হাঁটলো ওরা। উড়ুক্কু বানরের দল যে লম্বা গাছের ডালপালার ভেতর কাকতাড়ুয়ার কাপড়চোপড় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল সেই গাছের নিচে এসে সবাই থেমে দাঁড়ালো।

খুব লম্বা গাছটা। গুঁড়ি এতো মসৃণ যে কারো পক্ষে বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু কাঠুরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'এক্ষুণি আমি এ-গাছ কেটে শুইয়ে দিচ্ছি, তাহলেই কাকতাড়ুয়ার জামাকাপড় অনায়াসে হাতে পেয়ে যাবো আমরা।'

টিন-মিস্ত্রিরা যখন কাঠুরেকে মেরামত করতে ব্যস্ত ছিলো সেসময় এক উইঙ্কি স্বর্ণকার খাঁটি সোনা দিয়ে তার কুড়ুলের একটা হাতল তৈরি করে সেটা পুরনো ভাঙা হাতলের জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিল। অন্য কয়েকজন উইঙ্কি কুড়ুলের ফলা ঘষে সমস্ত মরচে তুলে ফেলে পালিশ করা রুপোর মতো চকচকে করে রেখেছিল।

কথা ব'লে আর দেরি না করে টিনের কাঠুরে গাছ কাটতে শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাণ্ড গাছটা কাত হয়ে সশব্দে আছড়ে পড়লো মাটিতে। ডালপালার ভেতর থেকে কাকতাড়ুয়ার কাপড়ের পুঁটুলি ছিটকে বেরিয়ে এসে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়লো।

ডরোথি কুড়িয়ে আনলো পুঁটুলিটা। উইঙ্কিরা সেটা পীত প্রাসাদে

বয়ে নিয়ে এলো। সেখানে সুন্দর পরিচ্ছন্ন খড় পুরে দেয়া হলো আবার কাপড়গুলোর ভেতরে। কী আশ্চর্য, একটু পরেই দেখা গেল, আগের সেই কাকতাড়ুয়া দাঁড়িয়ে আছে অবিকল একই চেহারা নিয়ে। তাকে উদ্ধার করার জন্যে সবাইকে বারবার ধন্যবাদ দিচ্ছে সে।

অনেকদিন পর আবার সবাই এক হয়েছে। ডরোথি আর তার বন্ধুরা কয়েকটা দিন খুব মজা করে পীত প্রাসাদে কাটিয়ে দিলো। আরাম-আয়েশের জন্যে যা-কিছু দরকার সবই তারা পেলো সেখানে।

শেষে আবার একদিন এম কাকীর কথা ভেবে ডরোথির মন উতলা হয়ে উঠলো। 'এবার ওজের কাছে ফিরে যাই চলো আমরা,' সঙ্গীদের বললো সে, 'কথা রক্ষা করতে বলি তাকে।'

'ঠিক বলেছো,' কাঠুরে বলে উঠলো। 'শেষ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ড পাচ্ছি আমি তাহলে।'

'আমি মগজ পাচ্ছি,' সোল্লাসে যোগ করলো কাকতাড়ুয়া।

'আর আমি পাচ্ছি সাহস,' সিংহ চিন্তামগ্নভাবে বললো।

'আমিও ফিরে যেতে পারছি ক্যানসাসে,' হাততালি দিয়ে বলে উঠলো ডরোথি। 'চলো, কালই আমরা রওনা হয়ে যাই পান্নানগরীর পথে!'

তা-ই ঠিক হলো। পরদিন সমস্ত উইঙ্কিকে এক জায়গায় ডেকে ওরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো। ওরা চলে যাচ্ছে শুনে ভারী দুঃখ পেলো উইঙ্কিরা। বিশেষ করে টিনের কাঠুরে এ-ক'দিনে তাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। তারা তাকে পশ্চিমের এই পীতরাজ্যে থেকে গিয়ে তাদের শাসক হিসেবে রাজত্ব করার জন্যে বারবার

অনুরোধ জানাতে লাগলো। কিন্তু কেউই ওরা থাকতে রাজি হলো না, সবাই যাবেই যাবে।

উইঙ্কিরা তখন টোটো আর সিংহকে একটা করে সোনার গলাবন্ধ উপহার দিলো। ডরোথিকে দিলো হীরে বসানো একটা চমৎকার বালা। কাকতাড়ুয়া যাতে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট না খায় সেজন্যে উইঙ্কিরা তাকে দিলো একটা ছড়ি, সেটার মাথা সোনা দিয়ে মোড়ানো। টিনের কাঠুরে উপহার পেলো সোনার কারুকাজ করা দামী মণিমুক্তা বসানো একটা রুপোর তেলের পাত্র।

উপহার পেয়ে ডরোথি আর তার বন্ধুরা প্রত্যেকে উইঙ্কিদের উদ্দেশে মিষ্টি করে কিছু কথা বললো। উইঙ্কিদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে গেল সবার।

পথের জন্যে ঝুড়ি ভর্তি করে খাবার নেয়া দরকার। খাবার বের করবে বলে ডরোথি গিয়ে ডাইনীর আলমারি খুললো। তখুনি সোনার মুকুটটা চোখে পড়লো তার। নিজের মাথায় সেটা প'রে দেখলো, একেবারে ঠিক হচ্ছে। সোনার মুকুটের জাদুর কথা কিছুই জানে না সে, কিন্তু জিনিসটা এতো সুন্দর বলে মনে হলো তার কাছে যে মাথায় প'রে থাকবে বলে ঠিক করলো। নিজের সানবনেট খুলে রেখে দিলো ঝুড়িতে।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে পান্নানগরীর পথে রওনা হলো ওরা। উইঙ্কিরা হর্ষধ্বনি করে বিদায় জানালো। তাদের অজস্র শুভেচ্ছার বাণী সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললো ডরোথি আর তার বন্ধুরা।

www.boiRboi.blogspot.com

চোদ্দ

দুষ্ট ডাইনীর প্রাসাদ এবং পান্নানগরীর মধ্যে কোনো রাস্তা নেই—এমনকি পায়ে-চলা পথও নেই কোনো। ডরোথি আর তার সঙ্গীরা যখন ডাইনীর সন্ধানে বেরিয়েছিল তখন দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে ডাইনী উড়ুক্কু বানরদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। বানরের দল ডরোথি আর সিংহকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ডাইনীর প্রাসাদে। কিন্তু এখন বাটারকাপ আর উজ্জ্বল ডেইজি ফুলে ছাওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ-প্রান্তরের ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে পান্নানগরীতে ফিরে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন মনে হচ্ছে।

অবশ্য ওরা জানে, ওদের যেতে হবে সোজা পুবদিকে—সেদিকে সূর্য ওঠে। ঠিক সেদিক বরাবরই ওরা চলতে শুরু করেছে। কিন্তু দুপুর-বেলা সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর উঠে এলো তখন আর পুব-পশ্চিম কিছুই ঠাহর করার উপায় রইলো না। বিশাল প্রান্তরের ভেতর পথ হারিয়ে ফেললো ওরা। তবু হেঁটে চললো অনুমানে ভর করে।

রাতের বেলা চাঁদ উঠলো আকাশে। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মিষ্টি সুবাসভরা উজ্জ্বল লাল ফুলের রাশির ভেতর শুয়ে পড়লো ওরা। সকাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ঘুমোলো। কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরে অবশ্য জেগে রইলো যথারীতি।

www.boiRboi.blogspot.com

সকালে দেখা গেল, সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে। তবু আবার যাত্রা শুরু করলো ওরা। এমনভাবে এগিয়ে চললো যেন কোন্‌দিকে যাচ্ছে তা ওদের পরিষ্কার জানা আছে।

'যদি আমরা একনাগাড়ে হেঁটে চলি,' ডরোথি বললো, 'একসময় তো কোথাও না কোথাও গিয়ে পৌঁছুবোই।'

কিন্তু দিনের পর দিন পার হয়ে যেতে লাগলো, তবু লাল ফুলে ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই ওরা চোখের সামনে দেখতে পেলো না।

কাকতাড়ুয়া খুঁতখুঁত করতে শুরু করলো।

'নিশ্চয় পথ হারিয়ে ফেলেছি আমরা,' শেষ পর্যন্ত বলে ফেললো সে। 'সময় থাকতে যদি পথ খুঁজে পান্নানগরীতে পৌঁছুতে না পারি, কোনদিন আমার মগজ পাওয়া হবে না।'

'আমিও তো তাহলে হৃৎপিণ্ড পাবো না,' টিনের কাঠুরে বলে উঠলো। 'কখন যে ওজের কাছে গিয়ে পৌঁছুবো—আর তর সইছে না আমার। সাংঘাতিক লম্বা পথ, স্বীকার করতেই হবে।'

'দেখো,' ক্ষীণ কণ্ঠে বললো ভীরু সিংহ, 'কোথাও গিয়ে পৌঁছুতে পারছি না, অথচ দিনের পর দিন এভাবে চলতেই থাকবো—এতো সাহস তো আমার নেই।'

শেষ পর্যন্ত ডরোথিও হতাশ হয়ে পড়লো। ঘাসের ওপর বসে পড়ে সঙ্গীদের দিকে তাকালো সে। সঙ্গীরাও বসে তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। একটা প্রজাপতি উড়ে গেল টোটোর মাথার পাশ দিয়ে—জীবনে প্রথমবারের মতো টোটোর মনে হলো, প্রজা-পতিটাকে তাড়া করার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই তার। জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে ডরোথির দিকে চেয়ে রইলো সে। যেন

জানতে চাইছে, এরপর ওরা কী করবে।

'আচ্ছা, মেঠো ইঁদুরদের ডাকলে কেমন হয়?' হঠাৎ বলে উঠলো ডরোথি। 'তারা হয়তো পারবে পান্নানগরীর পথ বলে দিতে।'

'নিশ্চয় পারবে!' চেঁচিয়ে উঠলো কাকতাড়ুয়া। 'আগে কেন কথাটা মাথায় আসেনি আমাদের?'

মেঠো ইঁদুরের রানীর দেয়া খুদে বাঁশিটা হাতে পাবার পর থেকে সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখে ডরোথি। সেটা ঠোঁটে তুলে কয়েকবার জোরে ফুঁ দিলো সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য খুদে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ধূসর রঙের ছোট ছোট অসংখ্য ইঁদুর ডরোথির দিকে ছুটে আসতে থাকলো। রানী ইঁদুরকেও দেখা গেল তাদের মধ্যে। মিহি গলায় চিঁ-চিঁ করে বললো সে:

'বন্ধুদের জন্যে কী করতে পারি আমি?'

'আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি,' বললো ডরোথি। 'পান্নানগরী কোন্‌দিকে তুমি বলতে পারো?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিলো রানী, 'কিন্তু সে তো এখান থেকে অনেক দূর। তোমরা উল্টোদিকে হেঁটে এসেছো।' হঠাৎ ডরোথির মাথার সোনার মুকুটটা চোখে পড়তেই সে বলে উঠলো, 'জাদুর মুকুট কাজে লাগাচ্ছো না কেন তুমি? উড়ুক্কু বানরদের ডাকছো না কেন? ওরা তোমাদের এক ঘণ্টারও কম সময়ে পান্নানগরীতে পৌঁছে দেবে।'

'এই মুকুটে জাদু আছে নাকি?' আশ্চর্য হয়ে বললো ডরোথি। 'কী জাদু?'

'সোনার মুকুটের ভেতরের দিকটাতে সব লেখা আছে,' ইঁদুরের রানী উত্তর দিলো। 'তবে তুমি উড়ুক্কু বানরদের ডাকো যদি,

আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। ভারী পাজি ওরা, আমাদের জ্বালাতন করে দারুণ মজা পায়।'

'আমার কোনো ক্ষতি করবে না ওরা?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলো ডরোথি।

'না না, ওই মুকুট যার মাথায় থাকবে তাকে ওদের মান্য করতেই হবে। চলি আমরা!' বলেই দ্রুত ছুটে চোখের আড়াল হয়ে গেল ইঁদুরের রানী। অন্য সমস্ত ইঁদুরও তার পিছু পিছু ছুট দিলো।

সোনার মুকুটের ভেতরের দিকে তাকালো ডরোথি। দেখলো, ভেতরের পিঠে সত্যিই কী সব লেখা আছে। এগুলোই নিশ্চয় জাদুমন্ত্র, ভাবলো সে। নির্দেশগুলো ভালোভাবে পড়ে নিয়ে মুকুটটা আবার মাথায় দিলো।

'এপ্‌-পি, পেপ্‌-পি, কাক্‌-কি!' বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো ডরোথি।

'কী বললে?' জিজ্ঞেস করলো কাকতাড়ুয়া। ডরোথি কী করছে জানে না সে।

'হিল্‌-লো, হল্‌-লো, হেল্‌-লো!' ডরোথি বলে চললো—এবার সে দাঁড়িয়েছে ডান পায়ে ভর করে।

'জিজ্‌-জি, জুজ্‌-জি, জিক্‌!' দু'পায়ে দাঁড়িয়ে বললো সে তারপর।

জাদুমন্ত্র উচ্চারণ শেষ। কয়েক মুহূর্ত পরই প্রবল কিচিরমিচির শব্দ শুনতে পেলো ওরা, সেইসঙ্গে অনেক পাখার ঝট্‌পটানি। উড়ুক্কু বানরের দল উড়ে এসে হাজির হলো ওদের কাছে।

সর্দার বানর মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলো ডরোথিকে। 'কী হুকুম?' জানতে চাইলো সে।

'পথ হারিয়ে ফেলেছি আমরা,' বললো ডরোথি, 'আমরা পান্না-

www.boiRboi.blogspot.com

নগরীতে যেতে চাই।'

'আমরা তোমাদের বয়ে নিয়ে যাবো,' বানরসর্দার জবাব দিলো। পরমুহূর্তে সে এবং আরেকটা বানর ডরোথিকে হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে শূন্যে তুলে উড়িয়ে নিয়ে চললো। অন্যান্য কিছু বানর বয়ে নিয়ে চললো কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরে এবং ভীরু সিংহকে। তাদের পেছনে ছোট একটা বানর টোটোকে নিয়ে রওনা হলো। টোটো তাকে কামড়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলো খুব।

কাকতাড়ুয়া এবং টিনের কাঠুরে প্রথমে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল; উড়ুক্কু বানরেরা এর আগে তাদের যে দুর্গতি করেছে তা তাদের বেশ মনে আছে। কিন্তু যখন দেখলো বানরেরা কোনো ক্ষতি করার মতলব করছে না, তখন তারা খুশি মনে উড়ে চললো শূন্যের ভেতর দিয়ে। অনেক নিচে সুন্দর সুন্দর বাগান আর বনভূমির দৃশ্য। সেসব তাকিতে তাকিয়ে দেখতে বেশ লাগছে দু'জনের।

দুই প্রকাণ্ড বানরের মাঝখানে থেকে ডরোথি অনায়াসে ভেসে চলেছে। বানরদু'টো হাত ধরাধরি করে একটা আসনের মতো তৈরি করে দিয়েছে তার জন্যে। তার যাতে ব্যথা না লাগে সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছে বানরসর্দার আর তার অনুচর।

'সোনার মুকুটের জাদুর বশ কী করে হলে তোমরা?' ডরোথি প্রশ্ন করলো।

'সে অনেক কথা,' হেসে উঠে বললো বানরসর্দার। 'তবে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের—তুমি যদি চাও, সে-কাহিনী তোমাকে শুনিয়ে সময়টা পার করতে পারি।'

'শুনতে পেলে খুব খুশি হবো আমি,' ডরোথি জবাব দিলো।

'একদিন আমরা স্বাধীনই ছিলাম,' শুরু করলো বানরসর্দার,

'সুখেশান্তিতে বসবাস করতাম বিশাল বনে, গাছ থেকে গাছে উড়ে বেড়াতাম, মনের সুখে ফলমূল খেতাম। এককথায়, যা ইচ্ছে তাই করতাম, কাউকে মনিব বলে মানতে হতো না। দুষ্টু বুদ্ধি গিজ্‌গিজ্ করতো সবার মাথায়। আমাদের কেউ কেউ হয়তো কখনো কখনো একটু বেশিই দুষ্টুমি করে ফেলতো—উড়ে নিচে নেমে যে-সব প্রাণীর পাখা নেই তাদের লেজ ধরে টানাটানি করতো কেউ, কেউ পাখিদের পিছু ধাওয়া করে বেড়াতো, কেউ আবার বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকজনের গায়ে ফল ছুঁড়ে মারতো। কিন্তু ভাবনাহীন সুখী জীবন যাপন করতাম আমরা, সবসময় আনন্দে মেতে থাকতাম, দিনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতাম সবাই। এসব অনেক আগের কথা বলছি আমি—জাদুকর ওজ যখন মেঘের দেশ থেকে এসে এ-দেশ শাসন করতে শুরু করে, তারও অনেক আগের কথা।

'সে-সময় উত্তরে বাস করতো এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। জাদু-বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলো সে। তবে সমস্ত জাদু সে ব্যবহার করতো অন্যের উপকারের জন্যে, কেউ কোনদিন শোনেনি যে সে কোনো ভালো লোকের সামান্যতম ক্ষতি করেছে। তার নাম ছিলো গেয়েলেট। চুনির বড়ো বড়ো চাঁই দিয়ে তৈরি সুন্দর এক প্রাসাদে সে বাস করতো। সবাই ভালোবাসতো তাকে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ ছিলো, এমন কাউকে সে খুঁজে পায়নি যাকে সে বিনিময়ে ভালোবাসতে পারে। পুরুষ যারা ছিলো সে-দেশে তারা তার মতো সুন্দরী এবং বিদুষী একজন নারীর তুলনায় ছিলো নিতান্তই নির্বোধ এবং কুশ্রী।

'যাই হোক, অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত পছন্দসই এক কিশোর ছেলের সন্ধান পায় গেয়েলেট। বয়সের তুলনায় ছেলেটা ছিলো

www.boiRboi.blogspot.com

ভারী সুদর্শন, সুপুরুষ এবং বুদ্ধিমান। রাজকন্যা সিদ্ধান্ত নিলো, ছেলেটা যখন পূর্ণবয়স্ক যুবক হয়ে উঠবে তখন সে তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে। ছেলেটাকে নিজের চুনির প্রাসাদে নিয়ে গেল সে। তারপর সমস্তরকম জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে তাকে দিনে দিনে এমন স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন এবং গুণবান করে তুললো যাতে যে-কোনো রমণীর কাঙ্ক্ষিত পুরুষ বলে সে গণ্য হতে পারে। ছেলেটার নাম ছিলো কোয়েলালা। যখন সে যুবক হয়ে উঠলো, দেশের সবচেয়ে গুণবান এবং বিজ্ঞ পুরুষ হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ গেয়েলেট গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললো তাকে। আর দেরি না করে সে বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

'সে-সময় উড়ুক্কু বানরদের রাজা ছিলো আমার বাবার বাবা। গেয়েলেটের প্রাসাদের কাছে এক বনে বাস ছিলো তার। এক পেট ভালো খাবারের চেয়ে বরং একটা মজার তামাশা তার অনেক প্রিয় ছিলো। গেয়েলেটের বিয়ের ঠিক আগে একদিন দাদু তার দলবল নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় তার চোখে পড়লো, নদীর তীরে কোয়েলালা হাঁটছে একা একা। তার পরনে লাল সিল্ক আর বেগুনি মখমলের দামী পোশাক। দাদু ভাবলো, একটু মজা করা যাক। তার নির্দেশমতো বানরের দল উড়ে গিয়ে নদীর তীরে নেমে কোয়েলালাকে চেপে ধরে শূন্যে তুলে নিয়ে এলো। তারপর নদীর ওপর উড়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলো পানির মধ্যে।

'"সাঁতার দাও, এই যে ফুলবাবু,' দাদু ওপর থেকে চিৎকার করে বললো, 'দেখো আবার পানিতে ভিজে কাপড় নোংরা হয়ে গেল কিনা।"'

'সাঁতার খুব ভালোই জানা ছিলো কোয়েলালার; তাছাড়া শত

ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সে বাবু বনে যায়নি। পানির ওপর ভেসে উঠে হাসলো সে। তারপর সাঁতরে তীরে গিয়ে উঠলো। এমন সময় গেয়েলেট প্রাসাদ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। দেখলো, কোয়েলালার সিল্ক আর ভেলভেটের পোশাক নদীর জলে ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

'খুব রেগে গেল রাজকন্যা। এ কাদের কীর্তি তা-ও তার বুঝতে মোটেই অসুবিধে হলো না। তার নির্দেশে সমস্ত উড়ুক্কু বানরকে তার সামনে হাজির করা হলো। প্রথমে বললো সে, সবার পাখা বেঁধে কোয়েলালার মতোই নদীতে ফেলে দেয়া হবে। কিন্তু আমার দাদু অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো, কারণ তার জানা ছিলো, পাখা বাঁধা থাকলে নদীতে ডুবে সব বানর মারা পড়বে। কোয়েলালাও সদয় হয়ে তাদের ক্ষমা করে দিতে রাজকন্যাকে অনুরোধ জানালো। শেষ পর্যন্ত একটা শর্তে বানরদের রেহাই দিতে রাজি হলো গেয়েলেট। শর্তটা হচ্ছে, এরপর থেকে উড়ুক্কু বানরেরা চিরকাল সোনার মুকুটের মালিকের আজ্ঞাধীন থাকবে। মুকুটের মালিক যে-ই হোক না কেন, তার তিনটে হুকুম পালন করতে বাধ্য থাকবে বানরেরা। মুকুটটা বানানো হয়েছিল বিয়ের উপহার হিসেবে কোয়েলালাকে দেবার জন্যে। শোনা যায়, এর জন্যে রাজকন্যাকে অর্ধেক রাজত্ব হাতছাড়া করতে হয়েছিল। বুঝতেই পারছো, আমার দাদু এবং অন্য সমস্ত বানর রাজকন্যার শর্তে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকেই সোনার মুকুটের মালিকের তিন হুকুমের দাস হয়ে আছি আমরা আজ পর্যন্ত।'

'আগের মালিকদের কী হলো?' ডরোথি জানতে চাইলো। সোনার মুকুটের কাহিনী শুনে সে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

'কোয়েলালা ছিলো সোনার মুকুটের প্রথম মালিক,' বানরসর্দার জবাব দিলো, 'তার হুকুমই আমরা প্রথম পালন করি। তার কনে যেহেতু আমাদের সহ্য করতে পারতো না, বিয়ের পর সে আমাদের সবাইকে বনের ভেতর তার কাছে ডেকে আদেশ দেয়, আমরা যেন সবসময় এমনভাবে চলাফেরা করি যাতে কক্ষনো কোনো উড়ুক্কু বানরের ওপর রাজকন্যার দৃষ্টি না পড়ে। কোয়েলালার আদেশ আমরা খুশি মনে পালন করি, কারণ গেয়েলেটকে আমরা ভয় পেতাম সবাই।

'কোয়েলালার আর কোনো আদেশ আমাদের পালন করতে হয়নি। তারপর একদিন পশ্চিমরাজ্যের দুষ্ট ডাইনীর হাতে পড়লো সোনার মুকুটটা। তার হুকুমে আমরা উইঙ্কিদের ধরে তার দাস বানিয়ে দিই, তারপর স্বয়ং ওজকে তাড়িয়ে দিই পশ্চিমরাজ্য থেকে। এখন সোনার মুকুটের মালিক তুমি। তিনবার তুমি তোমার ইচ্ছে-মতো আমাদের যে-কোনো আদেশ করতে পারো।'

বানররাজের কাহিনী শেষ হতেই ডরোথি নিচে তাকিয়ে দেখলো, ওদের সামনে পান্নানগরীর সবুজ ঝক্‌মকে প্রাচীর। কতো দ্রুত উড়ে এসেছে বানরেরা, ভেবে সে অবাক হয়ে গেল। যাত্রা শেষ হয়েছে বলে খুশি হয়ে উঠলো সেইসঙ্গে। আজব প্রাণীগুলো সাবধানে নগরতোরণের সামনে নামিয়ে দিলো ওদের। বানররাজ অনেকখানি ঝুঁকে ডরোথিকে কুর্নিশ করলো। তারপর দলবল নিয়ে আবার আকাশে উড়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

'বেশ হলো যাত্রাটা,' বললো ডরোথি।

'হ্যাঁ, দেখতে দেখতে আপদ চুকে গেল,' সিংহ উত্তর দিলো। 'ভাগ্যিস আজব মুকুটটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে তুমি!'

পনেরো

পান্নানগরীর প্রকাণ্ড তোরণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো চার অভি-যাত্রী। ঘণ্টা বাজালো। কয়েকবার ঘণ্টা বাজবার পর আগের সেই একই নগররক্ষী সিংহদ্বার খুলে দিলো।

'সেকি! ফিরে এসেছো তোমরা?' তাজ্জব হয়ে বললো সে।

'দেখতে পাচ্ছো না?' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো।

'কিন্তু আমি তো জানতাম, তোমরা পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনীর সন্ধানে গিয়েছিলে!'

'গিয়েছিলাম—তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের,' বললো কাক-তাড়ুয়া।

'আর তারপরও সে তোমাদের ফিরে আসতে দিলো?' হতভম্ব নগররক্ষী প্রশ্ন করলো।

'না দিয়ে যাবে কোথায়?' বললো কাকতাড়ুয়া, 'সে তো গ'লে শেষ হয়ে গেছে।'

'গ'লে শেষ হয়ে গেছে!' নগররক্ষী বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো প্রায়, 'এ দেখছি দারুণ সুসংবাদ! কিন্তু কে—কে তাকে গলিয়ে ফেললো?'

'ডরোথি,' সিংহ গম্ভীরভাবে বললো।

'বলো কী!' স্তম্ভিত নগররক্ষী অনেকখানি ঝুঁকে মহাসম্ভ্রমে

www.boiRboi.blogspot.com

ডরোথিকে কুর্নিশ করলো।

লোকটার পিছু পিছু ওরা তার গম্বুজ-আকৃতির সেই ছোট ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। আগের মতোই সে মস্ত বাক্স থেকে চশমা বের করে সবার চোখে সেঁটে দিলো। এরপর তোরণ পেরিয়ে পান্না-নগরীতে ঢুকলো ওরা।

নগররক্ষীর মুখে শহরের লোকজন যখন শুনতে পেলো, এই ভিন-দেশী আগন্তুকেরা পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনীকে গলিয়ে দিয়ে এসেছে, তখন সবাই এসে ঘিরে ধরলো ওদের। বিশাল জনতা ওদের পিছু পিছু ওজের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললো।

সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিক তেমনি প্রাসাদের দরজায় পাহারায় রয়েছে। কিন্তু এবার ডরোথি আর তার সঙ্গীদের দেখামাত্র ভেতরে ঢুকতে দিলো সে। আবার সেই সবুজ মেয়েটা এসে দাঁড়ালো ওদের কাছে, তখুনি প্রত্যেককে যার যার ঘরে নিয়ে গেল। ওজ দর্শন দিতে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত ওরা বিশ্রাম নেবে।

সৈনিক সোজা গিয়ে ওজকে জানালো, ডরোথি আর তার সঙ্গীরা দুষ্ট ডাইনীকে ধ্বংস করে আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু ওজের কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর এলো না।

ডরোথি আর তার বন্ধুরা ভেবেছিল, খবর পাওয়ামাত্র ওজ তাদের ডেকে পাঠাবে। কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ রইলো জাদুকর। পরদিনও তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না—তার পরের দিনও না—তার পরের দিনও না। অপেক্ষায় থেকে থেকে ওরা ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো সবাই। ওজের কথামতো ডাইনী বধ করতে গিয়ে কতো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে ওদের, ডাইনীর দাসত্ব পর্যন্ত করতে হয়েছে। আর তারপর কিনা ওজের

এই ব্যবহার!

শেষ পর্যন্ত কাকতাড়ুয়া সবুজ মেয়েটাকে আবার ওদের খবর নিয়ে যেতে বললো ওজের কাছে। সে বলে পাঠালো, ওজ যদি অবিলম্বে তাদের সাক্ষাৎ না দেয়, তাহলে সাহায্যের জন্যে উড়ুক্কু বানরদের ডাকবে ওরা—দেখে নেবে, জাদুকর তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না ক'রে যায় কোথায়।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র ওজ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালো সে, ডরোথি ও তার সঙ্গীরা যেন পরদিন সকাল ন'টা চার মিনিটে দরবারঘরে তার সঙ্গে দেখা করে। পশ্চিমরাজ্যে একবার উড়ুক্কু বানরদের কবলে পড়েছিল ওজ, আবার তাদের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে তার আদৌ নেই।

সেদিন রাতে ডরোথি কিংবা তার তিন বন্ধুর কারো ঘুম হলো না। ওজ যাকে যা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, জেগে জেগে প্রত্যেকে তার কথাই ভাবতে লাগলো। ডরোথি মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারই ভেতর স্বপ্ন দেখলো, ক্যানসাসে ফিরে গেছে সে—এম কাকী বলছে, কতো আনন্দ হচ্ছে তার ছোট্ট সোনামণিকে আবার ফিরে পেয়ে।

পরদিন সকালবেলা ন'টা বাজতে না বাজতেই সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিক ওদের কাছে এসে হাজির হলো। চার মিনিট পর সবাই গিয়ে ঢুকলো মহাশক্তিমান ওজের দরবারকক্ষে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকে ভেবেছিল, ওজকে আগে যে-চেহারায় দেখেছিল এবারও সে-চেহারায় দেখবে। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে ঘরে আদৌ কাউকে দেখতে না পেয়ে ওরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। দরজার কাছাকাছি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়োসড়ো হয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

দাঁড়িয়ে পড়লো সবাই। ওজের যতো চেহারা ওরা এর আগে দেখেছে সেসবের চেয়েও ভয়াবহ মনে হচ্ছে শূন্য ঘরের এই অটুট নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ গমগম করে উঠলো গম্ভীর একটা কণ্ঠ :

'আমি ওজ, মহাশক্তিমান ভয়াল ওজ। কেন তোমরা আমার সাক্ষাৎ চাও?' উঁচু গম্বুজ-আকৃতি ছাদের চূড়ার কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে কণ্ঠটা ভেসে আসছে বলে মনে হলো।

আবার ঘরের চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো ওরা। কেউ নেই।

'তুমি কোথায়?' প্রশ্ন করলো ডরোথি।

'সর্বত্র আছি আমি,' উত্তর এলো, 'কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে আমি অদৃশ্য। তোমরা যাতে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো সেজন্যে এখন আমি সিংহাসনে উপবেশন করছি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যি মনে হলো, সোজা সিংহাসন থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বরটা।

ওরা এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনের সামনে সার বেঁধে দাঁড়ালো। ডরোথি বললো :

'তোমার দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবী নিয়ে এসেছি আমরা, মহাশক্তিমান ওজ!'

'কিসের প্রতিশ্রুতি?' জিজ্ঞেস করলো ওজ।

'তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, দুষ্ট ডাইনীকে ধ্বংস করতে পারলে আমাকে ক্যানসাসে ফেরত পাঠিয়ে দেবে,' ডরোথি বললো।

'আর আমাকে তুমি বলেছিলে, মগজ দেবে,' বললো কাকতাড়ুয়া।

'আর আমাকে তুমি হৃৎপিণ্ড দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে,'

www.boiRboi.blogspot.com

টিনের কাঠুরে বলে উঠলো।

'আর আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সাহস দেবে,' বললো ভীরু সিংহ।

'দুষ্ট ডাইনী কি সত্যি ধ্বংস হয়ে গেছে?' অদৃশ্য ওজ প্রশ্ন করলো। ডরোথির মনে হলো, একটু যেন কেঁপে গেল এবার কণ্ঠটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো ডরোথি, 'এক বালতি জল ছুঁড়ে দিয়ে আমি তাকে গলিয়ে ফেলেছি।'

'আশ্চর্য!' ওজের বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল। 'ঠিক আছে, কাল এসো তোমরা আমার কাছে—আগে আমাকে একটু ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।'

'সেজন্যে এরই মধ্যে অনেক সময় নিয়েছো তুমি,' ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো টিনের কাঠুরে।

'আর একদিনও অপেক্ষা করতে রাজি নই আমরা!' ফুঁসে উঠলো কাকতাড়ুয়া।

'যেসব প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছো আমাদের, সব তোমাকে পূরণ করতে হবে!' ডরোথি বলে উঠলো।

সিংহ ভাবলো, এইসঙ্গে জাদুকরকে একটু ভয় পাইয়ে দিলে মন্দ হয় না। প্রচণ্ড শব্দে লম্বা একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সে। ভয়াল হিংস্র সেই গর্জন শুনে টোটো আঁতকে উঠে একলাফে সিংহের কাছ থেকে ছিটকে সরে গেল, হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘরের এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা পর্দার ওপর। পর্দাটা সশব্দে মেঝের ওপর কাত হয়ে পড়ে যেতেই ওরা চমকে সেদিকে ফিরে তাকালো। পরমুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সবাই।

যে-জায়গাটা পর্দার আড়াল হয়ে ছিলো ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে

আছে খুদে এক বুড়ো। টাক মাথা, কুঞ্চিত মুখ। ওদের মতো সে-ও খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

টিনের কাঠুরে কুড়ুল উঁচিয়ে ধেয়ে গেল খুদে লোকটার দিকে—চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে তুমি?'

'আমি ওজ, মহাশক্তিমান ভয়াল ওজ,' কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিলো খুদে লোকটা। 'মেরো না আমাকে—দয়া করো—তোমরা যা বলো তা ই করবো আমি।'

চোখে বিস্ময় আর শঙ্কা নিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো ডরোথি আর তার সঙ্গীরা।

'আমি ভেবেছিলাম ওজ একটা প্রকাণ্ড মাথা,' বললো ডরোথি।

'আর আমি ভেবেছিলাম ওজ এক সুন্দরী মহিলা,' কাকতাড়ুয়া বললো।

'আর আমার ধারণা ছিলো ওজ আসলে এক ভয়াল জানোয়ার,' বললো টিনের কাঠুরে।

'আর আমি মনে করেছিলাম ওজ মস্ত এক আগুনের গোলা,' সিংহ বললো সবিস্ময়ে।

'না, তোমাদের সবার ধারণা ভুল,' নিস্তেজ গলায় বললো খুদে লোকটা। 'আমি সবাইকে ধোঁকা দিয়েছি।'

'ধোঁকা দিয়েছো!' আর্তনাদ করে উঠলো ডরোথি। 'তুমি না এক বিরাট জাদুকর?'

'চুপ, বাছা!' তাড়াতাড়ি বললো লোকটা, 'অতো জোরে কথা ব'লো না, সবাই শুনে ফেলবে—সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। লোকে আমাকে বিরাট জাদুকর বলেই জানে।'

'আসলে তুমি তা নও তাহলে?' বললো ডরোথি।

'মোটেই না, বাছা। আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ।'

'শুধু তা-ই নও,' ক্ষুব্ধ স্বরে বললো কাকতাড়ুয়া, 'তুমি একটা বুজরুক।'

'ঠিক তাই!' সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করলো খুদে লোকটা; দু'হাত এমনভাবে ঘষছে একসঙ্গে, যেন খুশি হয়ে উঠেছে কথাটা শুনে। 'আমি সত্যি একটা বুজরুক।'

'কিন্তু এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার!' টিনের কাঠুরে বলে উঠলো, 'আমি তাহলে হৃৎপিণ্ড পাবো কোথায়?'

'আমি কোথায় সাহস পাবো?' বললো সিংহ।

'আমিই বা কোথায় মগজ পাবো?' কোটের হাতা দিয়ে চোখ থেকে জল মুছতে মুছতে বিলাপের সুরে বললো কাকতাড়ুয়া।

'বন্ধুগণ,' ওজ বলে উঠলো, 'আমি অনুরোধ করছি, এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমরা দুঃখ ক'রো না। আমার কথা একবার ভাবো, আসল রূপ প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় কী ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি আমি, ভেবে দেখো!'

'আর কেউ জানে না, তুমি একটা বুজরুক?' ডরোথি জিজ্ঞেস করলো।

'তোমরা চারজন ছাড়া—এবং আমি নিজে ছাড়া—আর কেউ জানে না,' জবাব দিলো ওজ। 'বহুকাল ধরে সবাইকে বোকা বানিয়ে এসেছি, তাই আমার ধারণা ছিলো আমার স্বরূপ কেউ কোনদিন জানতে পাবে না। এখন বুঝতে পারছি, দরবারঘরে তোমাদের ঢুকতে দিয়ে মস্ত ভুল করেছি আমি। এমনিতে আমি আমার প্রজাদের পর্যন্ত সাক্ষাৎ দিই না, ফলে সবাই ভাবে আমি সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর কোনকিছু।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না,' বিমূঢ় গলায় বললো ডরোথি, 'আমার সামনে প্রকাণ্ড একটা মাথার রূপ ধরে কী করে হাজির হয়েছিলে তুমি?'

'ওটা একটা বিশেষ চালাকি ছিলো আমার,' ওজ উত্তর দিলো। 'এদিকে এসো একটু, আমি সব বুঝিয়ে বলছি।'

সে ওদের পথ দেখিয়ে দরবারঘরের পেছনে ছোট একটা কুঠুরির ভেতর নিয়ে গেল। আঙুল তুলে দেখালো, এককোণে সেই প্রকাণ্ড মাথাটা পড়ে আছে। বহু প্রস্থ কাগজ একের পর এক সেঁটে তৈরি করা হয়েছে সেটা, তার ওপর মুখ এঁকে দেয়া হয়েছে নিখুঁতভাবে।

'সরু তার দিয়ে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম আমি এটা,' বললো ওজ, 'পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সুতো টেনে টেনে চোখ আর ঠোঁট নড়িয়েছিলাম।'

'কিন্তু গলার স্বর?' ডরোথি প্রশ্ন করলো।

'ও কিছু নয়, গলার কারসাজি জানি আমি,' বললো খুদে লোকটা, 'গলার স্বর যেখানে ইচ্ছে ছুঁড়ে দিতে পারি। তাতেই তুমি ভেবেছো, ওই মাথার ভেতর থেকে কথা ভেসে আসছে। এই দেখো, অন্য যে-জিনিসগুলো দিয়ে তোমাদের বোকা বানিয়েছি, সব আছে এখানে।' সুন্দরী রমণী সাজবার জন্যে যে পোশাক আর মুখোশ ব্যবহার করেছিল সে, সেগুলো দেখালো কাকতাড়ুয়াকে। টিনের কাঠুরে অবাক হয়ে দেখলো, তার দেখা সেই ভয়াল জানোয়ার আসলে একসঙ্গে সেলাই করা একগাদা চামড়া ছাড়া আর কিছু নয়; বড়ো বড়ো কাঠি জুড়ে সেটাকে খাড়া রাখা হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডটাও নকল জাদুকর ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। জিনিসটা আসলে ছিলো তুলোর একটা মস্ত পিণ্ড, তাতে বেশি করে তেল ঢেলে দেয়া-

www.boiRboi.blogspot.com

মাত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছিল।

'এসব বুজরুকির জন্যে সত্যি তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,' কাকতাড়ুয়া মন্তব্য করলো।

'আমি লজ্জিত—সত্যি লজ্জিত,' বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলো খুদে লোকটা, 'কিন্তু এছাড়া যে আর কিছু করারও ছিলো না আমার। বসো তোমরা—অনেক চেয়ার আছে, বসে পড়ো। আমার কাহিনী বলছি শোনো।'

বসলো সবাই। ওজ তার গল্প শুরু করলো:

'আমার জন্ম হয়েছিল ওমাহায়—'

'তাই নাকি!' ডরোথি বলে উঠলো, 'সে তো ক্যানসাস থেকে বেশি দূরে নয়!'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখান থেকে অনেক দূরে,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো ওজ। 'বড়ো হয়ে গলার স্বরের কেরামতি শিখে শব্দ-জাদুকর হলাম আমি; বড়ো এক ওস্তাদের কাছ থেকে খুব ভালোভাবে বিদ্যাটা রপ্ত করেছিলাম। যে-কোনো পশু বা পাখির ডাক আমি অনায়াসে নকল করতে পারি,' বলে অবিকল বেড়াল-বাচ্চার মতো মিউমিউ করতে শুরু করলো ওজ। সঙ্গে সঙ্গে টোটো কান খাড়া করে সত্যিকার বেড়ালের খোঁজে চারদিকে তাকাতে লাগলো।

'কিছুদিন পর,' ওজ বলে চললো, 'ও-বিদ্যায় আর তেমন মজা না পেয়ে আমি বেলুনে ওড়ার পেশা বেছে নিলাম।'

'সে আবার কী রকম?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'সার্কাসের দিনে বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়ার কাজ আরকি,' ব্যাখ্যা করলো ওজ, 'তাই দেখে লোকে এসে ভিড় করে, তারপর

পয়সা দিয়ে সার্কাস দেখে।'

'ও আচ্ছা,' বললো ডরোথি, 'জানি আমি।'

'তারপর কী হলো শোনো। একদিন অমনি বেলুনে চড়ে আকাশে উড়েছি, এমন সময় জট পাকিয়ে গেল দড়িতে, আমি আর মাটিতে নামতে পারলাম না। ওপরে উঠতে উঠতে মেঘের স্তর ছাড়িয়ে গেল বেলুন, তারপর বাতাসের এক প্রবল তোড়ের মুখে পড়ে বহু, বহু মাইল দূরে ভেসে চলে গেল। একদিন একরাত শূন্যের ভেতর দিয়ে উড়ে চললাম আমি। দ্বিতীয় দিন সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে দেখি, আমার বেলুন ভাসছে অপূর্ব সুন্দর এক অজানা দেশের ওপর।

'ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এলো বেলুন, আমি একটুও চোট পেলাম না। কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখলাম, অপরিচিত অদ্ভুত সব লোকজনের মাঝে এসে পড়েছি। মেঘের ভেতর থেকে আমাকে নেমে আসতে দেখে তারা ভেবেছে, আমি এক বিরাট জাদুকর। আমিও তা-ই ভাবতে দিলাম ওদের; কারণ দেখলাম, আমাকে বেশ ভয় পাচ্ছে সবাই—আমি যা বলবো ওরা তা-ই করতে রাজি।

'সরল লোকগুলোকে ব্যস্ত রাখার জন্যে খেয়ালখুশির বশে আমি এই শহর আর আমার প্রাসাদ তৈরির নির্দেশ দিলাম। খুশি মনে এবং বেশ নিপুণভাবে সব কাজ সারলো তারা। এরপর আমার মনে হলো, এই সুন্দর সবুজ দেশের নাম দেবো আমি পান্নানগরী। নামটাকে আরো লাগসই করার জন্যে সমস্ত লোকের চোখে সবুজ চশমা এঁটে দিলাম, যাতে সবকিছু সবুজ দেখায় তাদের দৃষ্টিতে।'

'কিন্তু এখানকার সবকিছু কি এমনিতেই সবুজ নয়?' ডরোথি বলে উঠলো।

'অন্য যে-কোনো শহরে যেমন, এখানেও তেমনি সবকিছু,' জবাব

দিলো ওজ, 'কিন্তু চোখে যখন সবুজ চশমা পরবে তুমি, তখন তো যা দেখবে তা-ই সবুজ মনে হবে। পান্নানগরীর পত্তন হয়েছিল অনেক অনেক বছর আগে; কারণ বেলুনে ভেসে যখন প্রথম এদেশে আসি তখন আমি যুবকমাত্র, আর এখন আমি হচ্ছি থুনথুনে বুড়ো। আমার প্রজারা এই এতকাল ধরে চোখে সবুজ চশমা প'রে আসছে। ফলে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকের এখন ধারণা, এটা সত্যি সত্যি পান্নার শহর। তবে শহরটা যে সত্যি সুন্দর তাতে কোনো সন্দেহ নেই; মণিমুক্তা আর দামী ধাতু ছাড়াও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে দরকারী সমস্ত রকম উপকরণ অঢেল রয়েছে এখানে। প্রজাদের মঙ্গলের চেষ্টা করেছি আমি সবসময়, তারাও আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু এই প্রাসাদ তৈরি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত নিজেকে অন্তরালে রেখেছি আমি—কাউকে দেখা দিইনি।

'আমার সবচেয়ে বড়ো একটা ভয় ছিলো ডাইনীদের নিয়ে। কারণ আমার নিজের আদৌ কোনো জাদুবিদ্যা জানা ছিলো না কোনকালে, অথচ শিগগিরই জানতে পেলাম, ডাইনীদের সত্যি অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করার ক্ষমতা রয়েছে। চারজন ডাইনী ছিলো এদেশে। উত্তর, দক্ষিণ, পুব এবং পশ্চিম রাজ্যের বাসিন্দাদের শাসন করতো তারা। সৌভাগ্যের কথা, উত্তর এবং দক্ষিণের ডাইনীদু'জন ভালো। আমি জানতাম, তারা আমার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু পুব এবং পশ্চিমের দুই ডাইনী ছিলো ভয়ানক শয়তান; ওরা আমাকে ওদের চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর ভাবতো বলে রক্ষা, নইলে আমাকে নির্ঘাত শেষ করে দিতো। তবু বহু বছর ধরে ওদের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থেকেছি আমি। কাজেই বুঝতেই পারছো আমি কতখানি খুশি হয়েছিলাম যখন শুনলাম, তোমার ঘর উড়ে এসে পূর্বরাজ্যের দুষ্ট

www.boiRboi.blogspot.com

ডাইনীর গায়ের ওপর পড়েছে। যখন তোমরা আমার কাছে এলে তখন আমি যে-কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত ছিলাম শুধু এই ভরসায় যে পশ্চিমের দুষ্ট ডাইনীকে তোমরা খতম করতে পারবে। তাকে গলিয়ে ধ্বংস করে এসেছো তোমরা, কিন্তু এখন আমি লজ্জার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই।'

'তুমি তো খুব খারাপ লোক দেখছি!' বললো ডরোথি।

'না না, তা নয়। আসলে খুব ভালো মানুষ আমি। তবে জাদুকর হিসেবে খুব খারাপ—স্বীকার করতেই হবে।'

'আমাকে তাহলে মগজ দিতে পারবে না তুমি?' জিজ্ঞেস করলো কাকতাড়ুয়া।

'তোমার তো মগজ দরকার নেই। প্রতিদিনই তুমি নতুন কিছু না কিছু শিখছো। বাচ্চাদের তো মগজ থাকে, কিন্তু খুব বেশি কিছু তাদের জানা থাকে না। একমাত্র অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের জন্ম দিতে পারে। আর যতো বেশি দিন তুমি পৃথিবীতে থাকবে ততো বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।'

'তুমি হয়তো খাঁটি কথাই বলছো,' বললো কাকতাড়ুয়া, 'কিন্তু মগজ না পেলে আমার মনের দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না।'

নকল জাদুকর ভালো করে দেখলো তাকে।

'বেশ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে, 'জাদুবিদ্যা বিশেষ কিছু আমার জানা নেই, আগেই বলেছি; তবু যদি কাল সকালে তুমি আমার কাছে আসো, তোমার মাথায় মগজ ভরে দেবো। তবে কিনা সে-মগজ কী করে ব্যবহার করতে হবে তা আমি বলে দিতে পারবো না—সেটা তোমাকে নিজেই বুঝে নিতে হবে।'

'ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো কাকতাড়ুয়া। 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ব্যবহারের উপায় আমি ঠিকই বের করে নেবো!'

'কিন্তু আমার সাহসের কী হবে?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলো সিংহ।

'প্রচুর সাহস আছে তোমার, নিঃসন্দেহে বলা যায়,' ওজ উত্তর দিলো। 'এখন তোমার দরকার শুধু আত্মবিশ্বাস। বিপদে পড়লে ভয় পায় না এমন কোনো প্রাণী নেই। ভয় পাওয়া সত্ত্বেও বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মধ্যেই রয়েছে সত্যিকার সাহস, এবং সেরকম সাহস তোমার প্রচুর আছে।'

'তা হয়তো আছে, তবু আমি কম ভীতু নই,' বললো সিংহ। 'ভয় ভুলবার মতো কিছু সাহস যদি তুমি আমাকে না দাও, আমি সত্যি বড়ো দুঃখ পাবো।'

'ঠিক আছে, কাল তোমাকে দেবো অমন সাহস,' ওজ উত্তর দিলো।

'আমার হৃৎপিণ্ডের কী হবে?' জিজ্ঞেস করলো টিনের কাঠুরে।

'তা যদি বলো,' জবাব দিলো ওজ, 'আমার কথা হলো, হৃৎপিণ্ড চাওয়াটাই তোমার ভুল। বেশির ভাগ লোকের জীবনে হৃদয়ের কারণেই দুঃখ নেমে আসে। হৃৎপিণ্ড নেই, সে তোমার সৌভাগ্য।'

'সে-ব্যাপারে নিশ্চয় নানা মত থাকতে পারে,' বললো টিনের কাঠুরে। 'আমার কথা বলতে পারি, তুমি যদি আমাকে হৃৎপিণ্ড দাও, সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আমি মুখ বুজে সহ্য করবো।'

'বেশ,' ওজ ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'কাল এসো আমার কাছে, হৃৎপিণ্ড পাবে। এতো বছর ধরে যখন জাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করে আসছি, নাহয় আরো কিছুটা সময় চালিয়ে গেলাম।'

www.boiRboi.blogspot.com

'এবার বলো,' বললো ডরোথি, 'আমার ক্যানসাসে ফেরার উপায় কী হবে?'

'সে-ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে দেখতে হবে,' জবাব দিলো খুদে লোকটা। 'দু'তিন দিন সময় দাও আমাকে, ভেবেচিন্তে দেখি তোমাকে মরুভূমির ওপারে নিয়ে যাবার কোনো উপায় বের করতে পারি কিনা। আপাতত তোমরা আমার অতিথি হিসেবেই থাকবে। যতক্ষণ প্রাসাদে আছো তোমরা, আমার লোকজন তোমাদের সেবা-যত্ন করবে, তোমাদের সমস্তরকম হুকুম পালন করবে। বিনিময়ে মাত্র একটা জিনিস চাই আমি—আমার আসল পরিচয় তোমরা গোপন রাখবে; আমি যে একটা বুজরুক তা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।'

যা জেনেছে কাউকে বলবে না বলে কথা দিলো ওরা। উৎফুল্ল মনে যার যার ঘরে ফিরে গেল। ডরোথি পর্যন্ত আশা করছে, 'মহা-শক্তিমান ভয়াল বুজরুক' সত্যি সত্যি পারবে তাকে ক্যানসাস ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। যদি পারে, লোকটার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত আছে সে।

www.boiRboi.blogspot.com

চৌধুরী পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

ষোলো

পরদিন সকালে কাকতাড়ুয়া বন্ধুদের বললো: 'আমায় অভিনন্দন জানাও তোমরা। শেষ পর্যন্ত সত্যি যাচ্ছি ওজের কাছে মগজ আনতে। যখন ফিরে আসবো তখন আর অন্যান্য মানুষের সাথে আমার কোনো পার্থক্য থাকবে না।'

'তুমি যেমন ছিলে তাতেই তোমাকে আমার সবসময় ভালো লেগেছে,' ডরোথি সহজভাবে বললো।

'একটা কাকতাড়ুয়াকে তোমার ভালো লেগেছে, সে তোমার উদার মনেরই পরিচায়ক,' জবাব দিলো কাকতাড়ুয়া। 'কিন্তু আমার নতুন মগজ থেকে যেসব দারুণ ভাবনা-চিন্তার জন্ম হবে সেসব শুনলে নিশ্চয় আমার সম্পর্কে আরো অনেক উঁচু ধারণা হবে তোমার।' খুশিতে টগবগ করতে করতে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে দরবারঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। টোকা দিলো দরজায়।

'ভেতরে এসো,' বললো ওজ।

ভেতরে ঢুকে কাকতাড়ুয়া দেখলো, খুদে লোকটা জানালার পাশে বসে আছে। গভীর চিন্তামগ্ন মনে হচ্ছে তাকে।

'আমার মগজের জন্যে এসেছি,' কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বললো কাকতাড়ুয়া।

'ও হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওই চেয়ারটায় ব'সো,' উত্তর দিলো ওজ। 'আশা করি কিছু মনে করবে না—তোমার মাথাটা খুলে নেবো আমি। ঠিক জায়গায় মগজ ভরে দিতে হলে এছাড়া উপায়ও নেই।'

'কোনো অসুবিধে নেই,' বললো কাকতাড়ুয়া। 'আবার যখন জুড়ে দেবে তখন তো আরো ভালো কাজ দেবে মাথাটা। কাজেই এখন স্বচ্ছন্দে খুলে নিতে পারো।'

কাকতাড়ুয়ার মাথাটা ধড় থেকে খুলে নিয়ে সেটার ভেতর থেকে সমস্ত খড় বের করে নিলো ওজ। তারপর পেছনের ঘরে গিয়ে কিছু ভুসি মেপে নিয়ে তার সঙ্গে অসংখ্য আলপিন আর সুচ মেশালো। জিনিসগুলো একসঙ্গে করে বেশ করে ঝাঁকিয়ে সেই মিশ্রণ দিয়ে কাকতাড়ুয়ার মাথার ওপরের দিকটা ভর্তি করলো সে। বাকি ফাঁকা অংশের ভেতর ফের খড় গুঁজে দিলো।

কাকতাড়ুয়ার দেহের সঙ্গে মাথাটা আবার জুড়ে দিয়ে সে বললো, 'বাহাদুর লোক হয়ে গেলে তুমি আজ থেকে—প্রচুর টাটকা মগজ ভরে দিয়েছি আমি তোমার মাথায়।'

জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধ পূরণ হওয়ায় যেমন খুশি হয়ে উঠলো কাকতাড়ুয়া, তেমনি গর্ববোধ করতে লাগলো। ওজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল।

ডরোথি কৌতূহলী চোখে তাকালো কাকতাড়ুয়ার দিকে। তার মাথার ওপর দিকটা মগজের চাপে বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে।

'কেমন লাগছে?' জানতে চাইলো ডরোথি।

'বেশ জ্ঞানী জ্ঞানী লাগছে নিজেকে সত্যি,' কাকতাড়ুয়া অকপটে জবাব দিলো। 'মগজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর আমার আর জানতে কিছু বাকি থাকবে না।'

'অতো সুচ আর আলপিন বেরিয়ে আছে কেন তোমার মাথা থেকে?' টিনের কাঠুরে প্রশ্ন করলো।

'ওর মগজভর্তি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ওগুলো তারই প্রমাণ,' মন্তব্য করলো সিংহ।

'এবার তাহলে আমাকে যেতে হয় ওজের কাছে হৃৎপিণ্ড আনতে,' কাঠুরে বললো। দরবারঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিলো সে।

'ভেতরে এসো,' বললো ওজ।

ভেতরে ঢুকে কাঠুরে বললো, 'আমি হৃৎপিণ্ড নিতে এসেছি।'

'খুব ভালো কথা,' জবাব দিলো খুদে লোকটা। 'তবে তোমার বুকে একটা ফুটো করতে হবে আমাকে, হৃৎপিণ্ডটা জায়গামতো বসাতে হবে তো। আশা করি তোমার ব্যথা লাগবে না।'

'না না,' উত্তর দিলো কাঠুরে, 'আমি আদৌ কিছু টেরই পাবো না।'

ওজ তখন একখানা টিন কাটার কাঁচি নিয়ে এসে টিনের কাঠুরের বুকের বাঁ-পাশে ছোট একটা চৌকো ছিদ্র করলো। তারপর দেরাজ খুলে বের করে আনলো চমৎকার একটা হৃৎপিণ্ড। পুরো সিল্কের তৈরি সেটা, ভেতরে করাতের গুঁড়ো দিয়ে ঠাসা।

'খুব সুন্দর না দেখতে?' প্রশ্ন করলো সে।

'হ্যাঁ, অপূর্ব সুন্দর!' দারুণ খুশি হয়ে বললো কাঠুরে। 'কিন্তু দয়া-মায়া আছে তো ওতে?'

'খু-ব!' ওজ জবাব দিলো। হৃৎপিণ্ডটা কাঠুরের বুকের ভেতর পুরে দিলো সে, তারপর চৌকো টিনের টুকরোটা আগের জায়গায় বসিয়ে নিখুঁতভাবে ঝালাই করে দিলো।

www.boiRboi.blogspot.com

'ব্যস,' বললো সে, 'এখন এমন একটা হৃৎপিণ্ডের অধিকারী হলে তুমি যা নিয়ে যে-কেউ গর্ব করতে পারে। তোমার বুকে একটা তালি দিতে হলো বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এছাড়া সত্যি কোনো উপায় ছিলো না।'

'তালি থাকলো তো কী হলো,' খুশিতে ডগমগ কাঠুরে বললো। 'তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমি, তোমার দয়ার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না।'

'থাক, থাক, ওসব আর বলতে হবে না,' জবাব দিলো ওজ।

বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল টিনের কাঠুরে। তার সৌভাগ্যের জন্য সবাই তাকে অভিনন্দন জানালো।

এবার সিংহ গিয়ে টোকা দিলো দরবারঘরের দরজায়।

'ভেতরে এসো,' বললো ওজ।

'সাহস নিতে এসেছি আমি,' ঘরে ঢুকে সিংহ বললো।

'বেশ তো,' জবাব দিলো খুদে লোকটা, 'দিচ্ছি তোমাকে সাহস।'

আলমারির সামনে গিয়ে ওপরের তাক থেকে একটা চৌকো সবুজ বোতল নামালো ওজ। সেটার ভেতরের তরল পদার্থটুকু সুন্দর কারুকাজ করা সবুজ একটা সোনার পাত্রে ঢেলে নিলো। তারপর পাত্রটা রাখলো ভীরু সিংহের সামনে।

জিনিসটা একটুখানি শুঁকে মুখ বাঁকালো সিংহ—যেন তার পছন্দ হচ্ছে না।

'খেয়ে নাও,' জাদুকর বললো।

'কী এটা?' জানতে চাইলো সিংহ।

'দেখো,' ওজ উত্তর দিলো, 'তোমার ভেতরে গেলে এটাই হবে সাহস। নিশ্চয় জানো, সাহস হচ্ছে ভেতরের ব্যাপার; কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত না এটুকু তুমি চুমুক দিয়ে খেয়ে নিচ্ছো ততক্ষণ এটাকে ঠিক সাহস বলা যাবে না। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, চটপট খেয়ে নাও জিনিসটা।'

আর ইতস্তত করলো না সিংহ, পাত্রের সবটুকু তরল পদার্থ নিঃশেষে পান করে নিলো।

'কেমন লাগছে এখন?' জানতে চাইলো ওজ।

'সাহসে ভরপুর,' সিংহ জবাব দিলো। উৎফুল্ল মনে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল সে নিজের সৌভাগ্যের কথা বলতে।

একা বসে ওজ নিজের সাফল্যের কথা ভেবে মুচকি হাসলো। কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরে আর সিংহ যে যা চেয়েছে ঠিক তাই সে তাদের দিতে পেরেছে।

'বুজরুক না হয়ে উপায় কী আমার,' বিড়বিড় করে বললো সে, 'এমন সব জিনিস এরা আমাকে করতে বলে যা সবাই জানে সম্ভব নয়। কাকতাড়ুয়া, সিংহ আর কাঠুরেকে খুশি করতে কষ্ট হয়নি, কারণ ওরা ধরে নিয়েছে আমার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু ডরোথিকে ক্যানসাস ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হলে মাথা খাটাতে হবে আরো অনেক বেশি। কীভাবে যে সম্ভব হবে কাজটা, বুঝতে পারছি না।'

www.boiRboi.blogspot.com

সতেরো

তিনদিন ওজের কোনো সাড়াশব্দ পেলো না ডরোথি। স্বাভাবিক-ভাবেই মন-মরা হয়ে রইলো সে। তার বন্ধুরা অবশ্য সবাই বেশ সুখী, পরিতৃপ্ত।

কাকতাড়ুয়া বলছে, আশ্চর্য সব চিন্তা খেলা করছে তার মাথায়; কিন্তু কী চিন্তা তা সে বলবে না, কারণ সে নিজে ছাড়া আর কেউ সেসব বুঝবে না। টিনের কাঠুরে হাঁটাহাঁটি করার সময় বুঝতে পারছে, তার বুকের ভেতর নড়াচড়া করছে নতুন হৃৎপিণ্ড। ডরোথিকে সে বলেছে, রক্তমাংসের মানুষ থাকা অবস্থায় যে-হৃৎপিণ্ড তার ছিলো সেটার তুলনায় নতুন এই হৃৎপিণ্ড আরো কোমল, আরো বেশি দয়ামায়ায় ভরা বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। সিংহ ঘোষণা করেছে, দুনিয়ায় কোনকিছুকেই আর সে ভয় পায় না; সে এখন সানন্দে একদল মানুষ কিংবা ডজনখানেক হিংস্র ক্যালিডার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে।

এভাবে দলের সবাই যার যার মতো সন্তুষ্ট, একমাত্র ডরোথির মনে সুখ নেই। ক্যানসাস ফেরার জন্যে সে আগের চেয়েও বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ দিনে ওজ ডেকে পাঠালো তাকে। আনন্দে তার মন নেচে

উঠলো। তাড়াতাড়ি রওনা হলো দরবারঘরের দিকে।

ডরোথি ঘরে ঢুকলে ওজ মিষ্টি করে বললো :

'ব'সো, বাছা। তোমাকে এ-দেশের বাইরে নিয়ে যাবার একটা উপায় বো। হয় আমি বের করতে পেরেছি।'

'এখান থেকে বেরিয়ে ক্যানসাসে ফেরার উপায়ের কথা বলছো তো ?' সাগ্রহে বললো ডরোথি।

'দেখো, ক্যানসাসের কথা আমি ঠিক বলতে পারছি না,' বললো ওজ, 'কারণ কোন্‌দিকে গেলে সেখানে পৌঁছুনো যাবে সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। তবে কিনা প্রথম কাজ হলো মরুভূমি পেরোনো, তারপর তোমার বাড়ির পথ খুঁজে পাওয়া এমনকিছু কঠিন হবে না।'

'মরুভূমি কী করে পাড়ি দেবো ?' ডরোথি জানতে চাইলো।

'আমার পরিকল্পনাটা কী বলছি শোনো,' খুদে লোকটা বললো। 'আগেই বলেছি তোমাকে, প্রথম এই দেশে এসে হাজির হয়েছিলাম আমি বেলুনে চড়ে। তুমিও এসেছিলে আকাশপথে, ঘূর্ণিবায়ুর কবলে পড়ে। তাই আমার মনে হয়, মরুভূমি পাড়ি দিতে হলে আকাশপথে উড়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো হবে। এখন, ঘূর্ণি-বায়ু তৈরি করা তো আমার সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে। তবে ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছি আমি; আমার মনে হয়, একটা বেলুন বানিয়ে নেয়া যেতে পারে।'

'কীভাবে ?' জানতে চাইলো ডরোথি।

'বেলুন জিনিসটা তৈরি হয় সিল্কের কাপড় দিয়ে,' বললো ওজ, 'যাতে গ্যাস বেরিয়ে না যায় সেজন্যে তার ওপর আঠার প্রলেপ দিয়ে দেয়া হয়। প্রচুর সিল্ক আছে আমার প্রাসাদে, কাজেই বেলুন

www.boiRboi.blogspot.com

তৈরি করতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু ওড়াতে হলে যে-গ্যাস দিয়ে বেলুন ভর্তি করতে হয় তা এ-দেশের কোথাও পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু বেলুন যদি না-ই ওড়ে, তাহলে তো কোনো কাজে আসছে না আমাদের,' ডরোথি বলে উঠলো।

'ঠিক,' জবাব দিলো ওজ। 'তবে বেলুন ওড়াবার আরো একটা উপায় আছে, গ্যাসের বদলে গরম বাতাস দিয়ে বেলুন ভর্তি করে নিলেও চলে। অবশ্য গ্যাসের মতো অতো ভালো কাজ দেয় না গরম বাতাস। বাতাস যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মরুভূমিতে নেমে আসবে বেলুন, আমরা হারিয়ে যাবো।'

'আমরা!' সবিস্ময়ে বলে উঠলো ডরোথি, 'তুমিও যাচ্ছো নাকি আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' উত্তর দিলো ওজ। 'এই বুজরুকের জীবন আর আমার ভালো লাগছে না। যদি এই প্রাসাদের বাইরে পা দিই আমি, প্রজারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে আমি জাদুকর নই; এতকাল তাদের ধোঁকা দিয়ে এসেছি বলে সবাই আমার ওপর খেপে যাবে। ফলে সারাদিন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হয় আমাকে, একেবারে হাঁপিয়ে উঠি। তার চেয়ে যদি তোমার সঙ্গে ক্যানসাস ফিরে গিয়ে আবার কোনো সার্কাসের দলে যোগ দিই, অনেক ভালো লাগবে আমার।'

'তুমি সঙ্গে গেলে খুশি হবো আমি,' বললো ডরোথি।

'ধন্যবাদ,' ওজ জবাব দিলো। 'এখন সিল্কের কাপড় সেলাইয়ের কাজে তুমি যদি সাহায্য করো, বেলুন তৈরির কাজ শুরু করে দিতে পারি আমরা।'

সুঁই-সুতো হাতে নিলো ডরোথি। ওজ সিল্কের কাপড়ের ফালি

www.boiRboi.blogspot.com

দরকারমতো আকারে কেটে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সেগুলো সেলাই করে সুন্দরভাবে একসঙ্গে জুড়ে দিতে লাগলো। ওজের ইচ্ছে, নানান রকম সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে তৈরি হবে বেলুনটা। তাই একের পর এক প্রথম ফালিটা দেয়া হলো হালকা সবুজ সিল্কের, দ্বিতীয় ফালিটা গাঢ় সবুজ সিল্কের, তৃতীয়টা পান্না সবুজ সিল্কের। সমস্ত ফালি সেলাই করে একসঙ্গে জুড়তে সময় লাগলো তিন দিন। কাজ শেষ হওয়ার পর ওরা পেলো বিশ ফুটেরও বেশি লম্বা প্রকাণ্ড একটা সবুজ সিল্কের থলি।

যাতে বাতাস বেরিয়ে না যায় সেজন্যে ওজ সেটার ভেতরের দিকে হালকা আঠার প্রলেপ লাগিয়ে দিলো। তারপর জানালো, বেলুন তৈরী।

'তবে আমাদের বসার জন্যে একটা ঝুড়ি চাই এখন,' বললো সে। সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিককে বড়ো একটা কাপড়ের ঝুড়ি নিয়ে আসতে আদেশ দিলো। সৈনিক ঝুড়ি নিয়ে এলে সে অনেকগুলো দড়ি দিয়ে সেটা ঝুলিয়ে দিলো বেলুনের নিচের দিকে।

সমস্ত আয়োজন শেষ হলে ওজ প্রজাদের কাছে ঘোষণা দিলো, মেঘের রাজ্যে তার এক জাদুকর ভাই থাকে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। আজব দৃশ্যটা দেখার জন্যে সমস্ত লোক এসে জড়ো হলো।

ওজের নির্দেশে বেলুনটা বাইরে বের করে প্রাসাদের সামনে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। দারুণ কৌতূহল নিয়ে লোকজন চেয়ে রইলো সেটার দিকে। ওজের কথামতো টিনের কাঠুরে এরমধ্যে বিরাট একগাদা কাঠ কেটে রেখেছিল, এবার সে সেগুলো দিয়ে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করলো। ওজ এগিয়ে গিয়ে বেলুনের তলার দিকটা

এমনভাবে আগুনের ওপর মেলে ধরলো যাতে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে আসা গরম বাতাস সিল্কের প্রকাণ্ড থলির ভেতর আটকা পড়ে যায়।

ধীরে ধীরে ফুলে উঠলো বেলুন, তারপর শূন্যে উঠে পড়লো। শেষ পর্যন্ত শুধু ঝুড়িটা মাটি ছুঁয়ে রইলো।

ওজ এবার উঠে পড়লো ঝুড়িতে। তারপর সমবেত সমস্ত লোকজনের উদ্দেশে উঁচু গলায় বললো :

'আমি মেঘের রাজ্যে যাচ্ছি আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। আমার অনুপস্থিতিতে কাকতাড়ুয়া এই রাজ্য শাসন করবে। আমি আদেশ দিচ্ছি, তোমরা আমাকে যেমন মান্য করে এসেছো, তাকেও ঠিক তেমনি মান্য করবে।'

যে-দড়ি দিয়ে বেলুনটাকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে সেটাতে ইতোমধ্যে জোর টান পড়তে শুরু করেছে। বেলুনের ভেতরের গরম বাতাসের কারণে সেটা বাইরের বাতাসের তুলনায় ওজনে অনেক হালকা হয়ে উঠেছে। ফলে এখন প্রবল শক্তিতে শূন্যে উঠে পড়তে চাইছে সেটা।

'উঠে এসো, ডরোথি!' জাদুকর চিৎকার করে ডাকলো। 'জলদি! নয়তো উড়ে যাবে বেলুন।'

'কিন্তু আমি যে টোটোকে খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও!' জবাব দিলো ডরোথি। ছোট্ট কুকুরটাকে ছেড়ে যেতে চায় না সে।

একটা বেড়ালছানার পিছু ধাওয়া করতে করতে টোটো ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পেলো ডরোথি। কুকুরটাকে হাতে তুলে নিয়ে বেলুনের দিকে ছুটলো।

বেলুনের কাছে পৌঁছুতে ডরোথির আর মাত্র কয়েক পা বাকি, ওজ দু'হাত বাড়িয়ে আছে তাকে ঝুড়িতে তুলে নেবার জন্যে, এমন

www.boiRboi.blogspot.com

সময় ফট্ করে ছিঁড়ে গেল দড়ি। ডরোথিকে ফেলে শূন্যে উঠে গেল বেলুন।

'নেমে এসো!' চিৎকার করে উঠলো ডরোথি। 'আমিও যাবো!'

'ফেরার উপায় নেই আর, বাছা!' ঝুড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বললো ওজ। 'বিদায়!'

'বিদায়!' নিচ থেকে প্রত্যুত্তর দিলো সবাই। প্রতিটি মানুষ ওপরের দিকে মুখ তুলে ঝুড়িতে বসা জাদুকরের দিকে চেয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে ওপরে, আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে বেলুন।

আজব জাদুকর ওজকে এরপর কেউ আর কোনদিন দেখেনি। কে জানে, সে হয়তো সত্যি নিরাপদে গিয়ে পৌঁছেছিল ওমাহায়, হয়তো সেখানেই আছে সে। তবে লোকে এখনও ভালোবাসে তাকে, তার কথা স্মরণ করে। একে অন্যকে বলে তারা :

'ওজ আমাদের বন্ধু ছিলেন চিরদিন। এখানে থাকতে এই সুন্দর পান্নানগরী তৈরি করিয়েছিলেন তিনি আমাদের জন্যে। এখন তিনি চলে গেছেন, কিন্তু আমাদের শাসন করার জন্যে রেখে গেছেন বিজ্ঞ কাকতাড়ুয়াকে।'

তবু আজব জাদুকরকে হারিয়ে তারা বহুকাল পর্যন্ত দুঃখ করেছে —সান্ত্বনা পায়নি কিছুতেই।

আঠারো

ক্যানসাসে ফেরার আশা বিলীন হয়ে যাওয়ায় খুব কাঁদলো ডরোথি। কিন্তু যখন সমস্ত ব্যাপার ভালোভাবে ভেবে দেখলো, তখন মনে হলো, বেলুনে চড়ে রওনা না হয়ে ভালোই করেছে। অবশ্য ওজকে হারিয়ে ওর খারাপ লাগতে লাগলো ; ওর সঙ্গীরাও মন-মরা হয়ে রইলো।

টিনের কাঠুরে কাছে এসে বললো :

'আমার এই চমৎকার হৃৎপিণ্ড যার দান তার জন্যে যদি একটু শোক করতে না পারি তাহলে সত্যি বড়ো অকৃতজ্ঞ মনে হবে নিজেকে। কিন্তু চোখের জল পড়লে যে আবার আমার জোড়গুলোতে মরচে ধরে যায়। যদি তুমি দয়া করে আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও, ওজকে হারানোর শোকে আমি একটু কাঁদবো।'

'সানন্দে,' উত্তর দিলো ডরোথি। সঙ্গে সঙ্গে একটা তোয়ালে নিয়ে এলো সে।

টিনের কাঠুরে কয়েক মিনিট ধরে কাঁদলো। তার চোখের জলের দিকে সাবধানে লক্ষ্য রাখলো ডরোথি, জলের প্রতিটি ফোঁটা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে মুছিয়ে দিলো। কান্না শেষ হলে কাঠুরে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালো তাকে, তারপর সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর

www.boiRboi.blogspot.com

জন্যে তার মণিমুক্তাখচিত তেলের টিন এনে শরীরের সমস্ত গাঁটে বেশ করে তেল লাগিয়ে নিলো।

কাকতাড়ুয়া এখন পান্নানগরীর অধিপতি। সে জাদুকর না হলেও প্রজারা তাকে নিয়ে যথেষ্ট গর্ববোধ করে। তাদের কথা হলো, 'পৃথিবীতে এমন শহর আর একটাও নেই যে-শহর শাসন করছে একজন খড় পোরা মানুষ।'

ওজ যেদিন বেলুনে চড়ে উড়ে গেল তার পরদিন সকালে ডরোথি এবং তার তিন বন্ধু আলাপ-আলোচনার জন্যে দরবারঘরে সমবেত হলো। কাকতাড়ুয়া বিরাট সিংহাসনটায় বসলো, অন্যরা বিনীত ভঙ্গিতে সার বেঁধে দাঁড়ালো তার সামনে।

'আমাদের ভাগ্য খুব খারাপ নয়,' বললো নতুন শাসনকর্তা। 'এই প্রাসাদ আর পান্নানগরী এখন আমাদের। আমরা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারি। যখন ভাবি, মাত্র কিছুদিন আগেও এক চাষীর ফসলের খেতে খুঁটির মাথায় লটকে ছিলাম আমি, আর আজ আমি এই সুন্দর নগরীর অধিপতি, তখন নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাই।'

'আমিও খুব খুশি আমার নতুন হৃৎপিণ্ড পেয়ে,' টিনের কাঠুরে বলে উঠলো। 'সত্যি বলতে কি, জগতে শুধু এই একটা জিনিসই চাইবার ছিলো আমার।'

'আমার কথা হচ্ছে, জগতের সমস্ত জন্তুর চেয়ে বেশি সাহসী না হলেও আমি যে-কোনো জন্তুর সমান সাহসী—এটুকু জেনেই আমি সন্তুষ্ট,' সিংহ বললো বিনয়ের সঙ্গে।

'শুধু ডরোথি যদি খুশি মনে পান্নানগরীতে থাকতে রাজি হতো, সবাই আমরা মজা করে একসঙ্গে বসবাস করতে পারতাম,' বললো

কাকতাড়ুয়া।

'কিন্তু আমি থাকতে চাই না এখানে,' ডরোথি বলে উঠলো, 'আমি ক্যানসাসে ফিরে গিয়ে এম কাকী আর হেনরি কাকার সঙ্গে থাকতে চাই।'

'বেশ তো, ঠিক আছে—কিন্তু কী করা যায় তাহলে এখন?' কাঠুরে বললো।

কাকতাড়ুয়া চিন্তাভাবনা করবে বলে মনস্থির করলো। এমন প্রাণপণে চিন্তা করতে শুরু করলো সে যে অসংখ্য আলপিন আর সুচের ডগা বেরিয়ে আসতে শুরু করলো তার মাথা ফুঁড়ে। শেষ পর্যন্ত বললো:

'উড়ুক্কু বানরদের ডাকো না কেন—মরুভূমির ওপর দিয়ে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে বলো!'

'তাই তো, কথাটা তো আগে আমার মাথায় আসেনি!' সোল্লাসে বলে উঠলো ডরোথি। 'ঠিক বলেছো তুমি! আমি এখুনি গিয়ে সোনার মুকুটটা নিয়ে আসছি।'

মুকুট নিয়ে দরবারঘরে ফিরে এসে জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করলো ডরোথি। একটু পরেই উড়ুক্কু বানরের দল খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'দ্বিতীয়বার ডাকলে তুমি আমাদের,' বানররাজ ডরোথিকে কুর্নিশ করে বললো। 'কী হুকুম?'

'তোমরা আমাকে ক্যানসাস নিয়ে চলো,' বললো ডরোথি।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো বানরসর্দার।

'সেটা সম্ভব নয়,' বললো সে। 'উড়ুক্কু বানরদের দেশ শুধু এটাই, এ-দেশের বাইরে যাওয়ার উপায় আমাদের নেই। আজ পর্যন্ত

কোনো উড়ুক্কু বানর ক্যানসাসে যায়নি, ভবিষ্যতেও কখনো যাবে বলে মনে হয় না—কারণ ক্যানসাস আমাদের স্বদেশ নয়। আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে হলে তোমার যে-কোনো আদেশ আমরা সানন্দে পালন করবো, কিন্তু মরুভূমি পাড়ি দিতে পারবো না। বিদায়।'

আরেকবার কুর্নিশ করে বানররাজ পাখা মেলে জানালা দিয়ে উড়ে চলে গেল। দলের সবাই অনুসরণ করলো তাকে।

হতাশায় প্রায় কেঁদে ফেললো ডরোথি।

'শুধু শুধু সোনার মুকুটের জাদুশক্তি নষ্ট করলাম আমি,' বললো সে, 'উড়ুক্কু বানরেরা তো আমাকে সাহায্য করতে পারছে না।'

'সত্যি খুব দুঃখের কথা!' কোমলহৃদয় কাঠুরে বলে উঠলো মৃদু কণ্ঠে।

আবার ভাবতে শুরু করেছে কাকতাড়ুয়া। চিন্তার চাপে তার মাথা এমন ভয়ানক ফুলে উঠেছে যে ডরোথির ভয় হতে লাগলো মাথাটা বুঝি ফেটেই যায়।

'সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিককে ডেকে তার পরামর্শ নিই এসো,' কাকতাড়ুয়া বললো অবশেষে।

সৈনিককে ডাকা হলো। ভয়ে ভয়ে দরবারঘরে ঢুকলো সে, কারণ ওজের আমলে সে কখনো ঘরের দরজা ছাড়িয়ে ভেতরে পা দেয়ার সুযোগ পায়নি।

'এই ছোট মেয়েটা মরুভূমি পেরোতে চায়,' সৈনিকের দিকে চেয়ে বললো কাকতাড়ুয়া, 'কীভাবে সম্ভব সেটা তার পক্ষে?'

'আমি বলতে পারি না,' বিনীতভাবে জবাব দিলো সৈনিক, 'কারণ স্বয়ং ওজ ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন মরুভূমি পেরিয়েছে বলে শুনিনি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'এমন কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করতে পারে?' ডরোথি ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলো।

'গ্লিণ্ডা পারবে হয়তো,' সৈনিক উত্তর দিলো।

'গ্লিণ্ডা কে?' জানতে চাইলো কাকতাড়ুয়া।

'দক্ষিণরাজ্যের ডাইনী। কোয়াডলিংদের শাসন করে সে। সব ডাইনীর মধ্যে তার ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া, মরুভূমির কিনারায় তার প্রাসাদ, মরুভূমি পাড়ি দেয়ার কোনো উপায় হয়তো তার জানা থাকতে পারে।'

'গ্লিণ্ডা তো ভালো ডাইনী, তাই না?' ডরোথি জিজ্ঞেস করলো।

'কোয়াডলিংরা নাকি তা-ই বলে,' বললো সৈনিক। 'সবার উপকার করে গ্লিণ্ডা। শুনেছি, সে আসলে এক অপূর্বসুন্দরী রমণী। বয়েস অনেক অনেক বছর হলেও সে জানে কী করে চিরনবীন থাকা যায়।'

'তার প্রাসাদে পৌঁছুনো যায় কীভাবে?' জানতে চাইলো ডরোথি।

'সোজা দক্ষিণদিকে যেতে হবে,' জবাব দিলো সৈনিক। 'কিন্তু শুনেছি, পথিকদের জন্যে নানান বিপদ-আপদে ভরা সেই পথ। বনের মধ্যে হিংস্র পশুর দল আছে; আরো আছে বিদঘুটে এক-জাতের মানুষ, তারা তাদের এলাকার ভেতর দিয়ে বিদেশীদের যেতে দিতে চায় না। সেই কারণে কোয়াডলিংরা কেউ কখনো পান্না-নগরীতে আসে না।'

সৈনিক ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর কাকতাড়ুয়া বললো:

'বিপদ-আপদ যা-ই থাকুক, আমার মনে হয়, দক্ষিণরাজ্যে গিয়ে গ্লিণ্ডার সাহায্য চাওয়াই ডরোথির পক্ষে সবচেয়ে ভালো। কারণ এখানে থাকলে তো সে কোনদিন ক্যানসাস ফিরে যেতে পারবে না।'

'নিশ্চয় তুমি আবার এতক্ষণ চিন্তা করছিলে,' টিনের কাঠুরে

মন্তব্য করলো।

'ঠিকই ধরেছো,' বললো কাকতাড়ুয়া।

'আমি ডরোথির সঙ্গে যাবো,' সিংহ বলে উঠলো। 'তোমার এই শহর আর আমার ভালো লাগছে না—আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে বনে-জঙ্গলে। আমি তো আসলে বন্য জন্তু, তোমরা জানো। তাছাড়া, বিপদ-আপদে ডরোথিকে সাহায্য করার জন্যে তার সঙ্গে কারো না কারো থাকা দরকার।'

'ঠিক বলেছো,' সায় দিলো কাঠুরে। 'আমার কুড়ুলও কোনো কাজে আসতে পারে তার, তাই আমিও যাবো তার সঙ্গে দক্ষিণ-রাজ্যে।'

'তাহলে কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলো কাকতাড়ুয়া।

'তুমিও যাবে নাকি?' সবাই বলে উঠলো সবিস্ময়ে।

'অবশ্যই। ডরোথি সাহায্য না করলে কোনদিন মগজ পাওয়া হতো না আমার। সে-ই আমাকে ফসলের খেতের খুঁটির ডগা থেকে তুলে এই পান্নানগরীতে নিয়ে এসেছে। আমার সমস্ত সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে সে। সে ভালোয় ভালোয় ফের ক্যানসাস রওনা হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তার সঙ্গ ছাড়ছি না।'

'অনেক ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বললো ডরোথি। 'তোমরা সত্যি ভালোবাসো আমাকে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি রওনা হতে চাই।'

'কাল সকালেই বেরিয়ে পড়বো আমরা,' কাকতাড়ুয়া ঘোষণা করলো। 'সবাই তৈরি হয়ে নিই এসো—অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

উনিশ

পরদিন সকালে ডরোথি সুন্দর সবুজ মেয়েটাকে চুমু খেয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলো। সবুজ দাড়িওয়ালা সৈনিকের সঙ্গে করমর্দন করলো সবাই। সৈনিক ওদের সঙ্গে নগরতোরণ পর্যন্ত হেঁটে এলো। ওদের আবার দেখে অবাক হয়ে গেল নগররক্ষী। সে ভাবতেও পারেনি, এই সুন্দর নগরী ছেড়ে আবার ওরা নতুন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পথে বেরোবে। সবার চোখ থেকে চশমা খুলে নিলো সে তাড়াতাড়ি, রেখে দিলো সবুজ বাক্সে। অনেক শুভেচ্ছা জানালো সবাইকে।

'তুমি এখন আমাদের শাসনকর্তা,' কাকতাড়ুয়ার উদ্দেশে বললো নগররক্ষী, 'কাজেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে শহরে ফিরে আসতে হবে।'

'যদি পারি অবশ্যই আসবো,' কাকতাড়ুয়া উত্তর দিলো, 'তবে সবচেয়ে আগে ডরোথিকে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করতে হবে আমাকে।'

ভালোমানুষ নগররক্ষীর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগে ডরোথি বললো :

'তোমাদের এই সুন্দর শহরে সবার কাছ থেকে আমি সুন্দর ব্যব-

www.boiRboi.blogspot.com

হার পেয়েছি। সেজন্যে কতখানি কৃতজ্ঞ আমি, বুঝিয়ে বলতে পারবো না।'

'সে-চেষ্টা না-ই বা করলে,' বললো নগররক্ষী। 'তুমি এখানে আমাদের সঙ্গে থাকলে খুব খুশি হতাম সবাই। কিন্তু তোমার যখন ক্যানসাস ফিরে যাবার এতোই ইচ্ছে, যেতে না দিয়ে উপায় কী! আশা করি বাড়ি ফেরার কোনো উপায় নিশ্চয় পেয়ে যাবে,' বলে বাইরের প্রাচীরের ফটক খুলে দিলো সে।

সবাই বেরিয়ে এলো। আবার শুরু হলো যাত্রা।

চারদিকে উজ্জ্বল রোদ। ডরোথি আর তার বন্ধুরা দক্ষিণরাজ্যের পথে বাঁক নিলো। সবারই মন বেশ প্রফুল্ল; হাসছে, গল্পগুজব করছে একে অন্যের সঙ্গে। বাড়ি ফেরার আশায় আবার অধীর হয়ে উঠেছে ডরোথির মন। কাকতাড়ুয়া আর টিনের কাঠুরে তার সাহায্যের জন্যে সঙ্গে আসতে পেরে খুব খুশি। ওদিকে সিংহ মনের আনন্দে তাজা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে—আবার প্রকৃতির কোলে ফিরে আসতে পেরে অকৃত্রিম খুশিতে লেজ নাড়ছে এপাশ-ওপাশ। টোটো দৌড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। উল্লাসে অবিরাম ঘেউঘেউ করতে করতে মথ আর প্রজাপতিদের তাড়া করে ফিরছে সে।

'শহুরে জীবন আমার একদম ধাতে সয় না,' সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে সিংহ বলে উঠলো। 'পান্না-নগরীতে থেকে আমি অনেক রোগা হয়ে গেছি। তবু আর তর সইছে না—কতো সাহস এখন আমার, সেটা অন্যসব জানোয়ারকে দেখাবার একটা সুযোগ শুধু চাই এবার।'

শহর ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছে ওরা। সবাই ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো পান্নানগরীর দিকে ফিরে তাকালো। সবুজ প্রাচী-

রের ওপাশে অসংখ্য মিনার আর বুরুজ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সবকিছু ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলে রয়েছে ওজের প্রাসাদের অনেকগুলো চূড়া আর গম্বুজ।

'ওজ কিন্তু আসলে খুব খারাপ জাদুকর ছিলো না,' মন্তব্য করলো টিনের কাঠুরে। তার বুকের ভেতর নড়াচড়া করছে ওজের দেয়া হৃৎপিণ্ড।

'হ্যাঁ, নইলে কি আর আমাকে মগজ দিতে পারতো সে—এমন খাসা মগজ।' কাকতাড়ুয়া বলে উঠলো।

'ওজ যে-সাহস আমাকে দিয়েছে তার খানিকটা যদি নিজে খেয়ে নিতো, তাহলে অনেক বেশি সাহসী হতে পারতো সে,' যোগ করলো সিংহ।

ডরোথি কিছুই বললো না। যে-প্রতিশ্রুতি ওজ ওকে দিয়েছিল তা রক্ষা করতে না পারলেও যেটুকু সাধ্য লোকটা করেছে। তাই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে ও। নিজের সম্পর্কে ঠিকই বলেছিল ওজ, জাদুকর হিসেবে বাজে হলেও মানুষ হিসেবে সে নেহাত মন্দ নয়।

পান্নানগরীর চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ফুলে ফুলে ছাওয়া সবুজ মাঠ। প্রথমদিন তারই ভেতর দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটলো ওরা। রাতের বেলা ঘুমোলো ঘাসের গালিচায় শুয়ে, ওপরে চেয়ে রইলো তারাভরা বিশাল আকাশ। ভারী চমৎকার বিশ্রাম হলো সবার।

সকালবেলা ওরা আবার হাঁটতে শুরু করলো। যেতে যেতে এক-সময় হাজির হলো এক ঘন বনের ধারে। সে-বনে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছ। ঘুরে এগিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই, কারণ ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

আছে বন। তাছাড়া পথ হারাবার ভয়ে ওরা দক্ষিণ দিক ছেড়ে অন্য কোনো দিকে এগোতেও ভরসা পাচ্ছে না। কাজেই সবাই মিলে খুঁজেপেতে দেখতে লাগলো, কোন্ জায়গা দিয়ে বনের ভেতর ঢোকা সবচেয়ে সহজ হবে।

সবার আগে রয়েছে কাকতাড়ুয়া। শেষ পর্যন্ত সে-ই আবিষ্কার করলো, বড়োসড়ো একটা গাছের বিশাল ছড়ানো ডালপালার নিচে বেশ খানিকটা ফাঁকামতো জায়গা রয়েছে। ওদিক দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে বনের ভেতর ঢুকে পড়তে পারবে ওরা।

হৃষ্টমনে এগিয়ে গেল সে গাছটার দিকে। কিন্তু যেইমাত্র প্রথম ডালপালাগুলোর নিচে পৌঁছেছে, অমনি সেগুলো ঝুঁকে এসে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরলো তাকে, পরমুহূর্তে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তার সঙ্গীদের কাছে।

ব্যথা পেলো না কাকতাড়ুয়া, কিন্তু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ডরোথি যখন তুলে দাঁড় করালো তাকে, তখন সে টলছে।

'এই যে এদিকে আরেকটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে গাছপালার ভেতর,' সিংহ বলে উঠলো এমন সময়।

'আগে আমি চেষ্টা করে দেখি,' কাকতাড়ুয়া বললো, 'আমাকে ছুঁড়ে ফেললেও চোট পাওয়ার ভয় নেই।' অন্য গাছটার দিকে এগিয়ে গেল সে কথা বলতে বলতে, কিন্তু সেটারও ডালপালা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে আঁকড়ে ধরলো তাকে, ফের ছুঁড়ে ফেলে দিলো বনের বাইরে।

'অদ্ভুত কাণ্ড তো!' বলে উঠলো ডরোথি, 'কী করবো তাহলে আমরা?'

'মনে হচ্ছে, গাছগুলো আমাদের সঙ্গে লড়ে যাবে বলে পণ

করেছে,' মন্তব্য করলো সিংহ, 'কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না।'

'আমি বোধ হয় একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি,' কাঠুরে বললো এবার। কাঁধে কুড়ুল ফেলে গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেল সে প্রথম গাছটার দিকে।

প্রকাণ্ড একটা ডাল ঝুঁকে এসে কাঠুরেকে ধরতে গেল। অমনি এমন ভয়ঙ্কর বেগে কুড়ুলের আঘাত হানলো সে যে চোখের পলকে কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল ডালটা। সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ব্যথায় থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো গাছের সমস্ত ডালপালা। টিনের কাঠুরে নিচ দিয়ে নিরাপদে পার হয়ে গেল।

'এসে পড়ো!' ফিরে তাকিয়ে সঙ্গীদের ডাকলো সে, 'জলদি!'

দৌড়ুলো সবাই, বিনা বাধায় গাছের নিচ দিয়ে পার হয়ে গেল। শুধু টোটোকে ধরে ফেললো ছোট একটা ডাল, কিন্তু তার আর্তনাদ শুনে টিনের কাঠুরে চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে এককোপে ডালটা কেটে ফেলে কুকুরটাকে মুক্ত করে দিলো।

বনের অন্যান্য গাছ ওদের বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না। কাজেই ওরা ধরে নিলো, শুধু প্রথম সারির গাছগুলোই ডালপালা নেড়ে আক্রমণ করতে পারে। সম্ভবত বনের পাহারাদার গাছ ওগুলো, অচেনা লোকজন যাতে বনে ঢুকতে না পারে সেজন্যেই এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ওদের।

চার পথিক বেশ সহজেই গাছপালার ভেতর দিয়ে হেঁটে বনের অন্য প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলো। তারপরই সামনে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল ওরা।

ওদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু এক দেয়াল; আগাগোড়া চীনেমাটির তৈরি বলে মনে হচ্ছে। চীনেমাটির বাসনের মতোই মসৃণ

www.boiRboi.blogspot.com

সে-দেয়ালের গা, উচ্চতায় ওদের মাথা ছাড়িয়ে গেছে।

'এখন কী করবো আমরা?' বলে উঠলো ডরোথি।

'মই বানিয়ে ফেলছি আমি একটা,' টিনের কাঠুরে উত্তর দিলো, 'এ-দেয়াল আমাদের পেরোতেই হবে।'

বিশ

বন থেকে গাছ কেটে এনে মই তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো টিনের কাঠুরে। অনেক পথ হেঁটে ডরোথি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে। সিংহও ঘুমোবার জন্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। টোটো শুলো তার পাশে।

কাঠুরের কাজ দেখতে দেখতে কাকতাড়ুয়া বললো:

'এখানে এই দেয়াল থাকার কী মানে হতে পারে, আর দেয়ালটা তৈরিই বা কী দিয়ে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তোমার মগজকে একটু বিশ্রাম দাও এবার,' কাঠুরে উত্তর দিলো, 'দেয়াল নিয়ে ভাবনা ক'রো না। দেয়াল টপকালেই আমরা জানতে পাবো ওপাশে কী আছে।'

একসময় মই তৈরি শেষ হলো। দেখতে ততো ছিমছাম না হলেও টিনের কাঠুরে আশ্বাস দিলো, জিনিসটা যথেষ্ট মজবুত, দিব্যি কাজ চলে যাবে ওদের।

ডরোথি, সিংহ এবং টোটোকে ঘুম থেকে তুলে কাকতাড়ুয়া জানালো, মই তৈরী। সে-ই প্রথম মই বেয়ে উঠতে শুরু করলো। কিন্তু একটু উঠেই এমন টলতে লাগলো যে ডরোথিকে তার পেছনে সেঁটে থেকে খেয়াল রাখতে হলো যেন সে পড়ে না যায়।

কাকতাড়ুয়ার মাথা দেয়াল ছাড়িয়ে ওঠামাত্র সবিস্ময়ে বলে উঠলো সে, 'কী আশ্চর্য!'

'উঠে যাও,' ডরোথি তাড়া দিলো।

আরো কিছুদূর উঠে কাকতাড়ুয়া দেয়ালের মাথায় চড়ে বসলো। এবার দেয়ালের ওপর মাথা তুললো ডরোথি। ঠিক কাকতাড়ুয়ার মতোই সে-ও অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, 'কী আশ্চর্য!'

এরপর উঠলো টোটো। দেয়ালের মাথায় উঠেই ঘেউঘেউ করতে শুরু করলো। ডরোথি শান্ত করলো তাকে।

সিংহ মই বেয়ে উঠে গেল এরপর। সবশেষে উঠলো টিনের কাঠুরে। তারাও দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়েই বিস্মিত স্বরে বলে উঠলো: 'কী আশ্চর্য!'

সবাই সার বেঁধে দেয়ালের ওপর বসে নিচের অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলো।

ওদের সামনে বিছিয়ে আছে এক অবারিত বিশাল রাজ্য। চীনেমাটির মস্ত থালার তলদেশের মতো মসৃণ চকচকে শাদা সে-রাজ্যের গোটা জমি। চারদিকে অসংখ্য ঘরবাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলোও আগাগোড়া চীনেমাটি দিয়ে তৈরি, আর উজ্জ্বল রঙে রঙ করা। তবে খুবই ছোট সেসব বাড়ি। সবচেয়ে বড়ো বাড়িগুলোও বড়জোর ডরোথির কোমর সমান উঁচু হবে। ছোট ছোট সুন্দর গোলাঘরও দেখা যাচ্ছে, চারপাশে চীনেমাটির বেড়া। এদিক ওদিক

অনেক গরু-ভেড়া-ঘোড়া-শুয়োরের পাল দাঁড়িয়ে আছে, মোরগ-মুরগী ছুটোছুটি করছে—সবই চীনেমাটির তৈরী।

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত হলো এই আজব দেশের অধিবাসীরা। উজ্জ্বল বর্ণের জামা আর সোনালি ছোপওয়ালা গাউন পরা গোয়ালিনী আর রাখাল মেয়ের দল; রুপোলি, সোনালি আর বেগুনি রঙের জমকালো ফ্রক পরা রাজকন্যা; গোলাপি, হলদে আর নীল ডোরা-কাটা পাজামা পরা আর সোনালি বকলস লাগানো জুতো পায়ে মেষপালকের দল; মণিমুক্তো বসানো মুকুট মাথায়, আরমিনের লোমে তৈরী আলখেল্লা আর সাটিনের আঁটোসাঁটো জামা পরা রাজপুত্র; লম্বা ছুঁচলো টুপি মাথায়, গালে গোলাকার লাল ছোপ আঁকা, কোঁচকানো গাউন পরা কিম্ভূত চেহারার সঙ—আরো কতো বিচিত্র লোকজন চারদিকে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সমস্ত মানুষ, এমনকি তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত চীনেমাটির তৈরি। তাছাড়া এতো ছোট সবাই যে সবচেয়ে লম্বা লোকটাও ডরোথির হাঁটুর সমান উঁচু হবে কিনা সন্দেহ।

ওদের দিকে প্রথমে কারো নজরই পড়লো না। শুধু বড়োসড়ো মাথাওয়ালা ছোট্ট একটা বেগুনি রঙের চীনেমাটির কুকুর দেয়ালের কাছে এসে ক্ষীণ স্বরে ঘেউঘেউ করলো খানিকক্ষণ, তারপর আবার ছুটে অন্যদিকে চলে গেল।

'আমরা এখন নিচে নামবো কী করে?' বললো ডরোথি।

মইটা এতো ভারী যে সবাই মিলে চেষ্টা করেও সেটা ওপরে টেনে তুলতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত কাকতাড়ুয়া লাফিয়ে নিচে নেমে দেয়ালের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। অন্য সবাই একে একে লাফ দিয়ে পড়লো তার খড়ে ঠাসা নরম শরীরের ওপর। অবশ্য

www.boiRboi.blogspot.com

খুব সাবধান থাকলো ওরা, যাতে কাকতাড়ুয়ার মাথার ওপর কারো পা না পড়ে—নইলে নির্ঘাত আলপিন আর সুচ ফুটে যেতো পায়ে। সবাই নিরাপদে নিচে নামবার পর কাকতাড়ুয়াকে টেনে তুলে দাঁড় করানো হলো। তার ব্যথা পাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু একেবারে চ্যাপটা হয়ে গেছে বেচারা। সবাই মিলে থাপড়ে আবার তার গড়ন ঠিক করে দিলো।

'এই আজব দেশের ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে ওপাশে চলে যাবো আমরা,' বললো ডরোথি, 'দক্ষিণ ছাড়া অন্য কোনো দিকে যাওয়া উচিত হবে না।'

চীনেমাটির মানুষের দেশের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো ওরা। প্রথমে সামনে পড়লো এক চীনেমাটির গোয়ালিনী, চীনেমাটির গরু দুইছে সে। ওরা কাছে যেতেই গরুটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলো হঠাৎ—তার পায়ের ঘায়ে টুল, বালতি, এমনকি গোয়ালিনী নিজেও ছিটকে গিয়ে সশব্দে গড়িয়ে পড়লো চীনেমাটির জমির ওপর।

ডরোথি আঁতকে উঠে চেয়ে দেখলো, গরুর একটা পা ভেঙে খসে পড়েছে, বালতিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, আর বেচারী গোয়ালিনীর বাঁ কনুইয়ের খানিকটা চটে গেছে।

'এ কী কাণ্ড তোমাদের!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলো গোয়ালিনী, 'দেখো, কী করেছো এসব! আমার গরুর পা ভেঙে গেছে—এখন আবার মেরামতির দোকানে নিয়ে গিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে আনতে হবে। এভাবে হঠাৎ এখানে এসে আমার গরুকে ভয় পাইয়ে দেয়ার মানে কী?'

'আমি দুঃখিত,' ডরোথি জবাব দিলো, 'ক্ষমা করো আমাদের।'

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু সুন্দরী গোয়ালিনী রাগে-দুঃখে আর কোনো কথাই বলতে পারলো না। গজ্‌গজ্‌ করতে করতে গরুর ভাঙা পা'টা কুড়িয়ে নিয়ে সামনে এগোলো। হতভাগা জানোয়ারটা তিন পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলো তার সঙ্গে। যেতে যেতে গোয়ালিনী বারবার মুখ ফিরিয়ে কুপিত চোখে তাকাতে লাগলো অদ্ভুত আগন্তুকদের দিকে। নিজের চিড়-খাওয়া কনুইটা সে ডান হাত দিয়ে দেহের সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে।

অঘটনটা ঘটে যাওয়ায় খুব মর্মাহত হয়েছে ডরোথি।

'এখানে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের,' কোমলহৃদয় কাঠুরে বলে উঠলো, 'নইলে হয়তো এই ছোট্ট সুন্দর মানুষগুলোর এমন ক্ষতি করে বসবো যা তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারবে না।'

আরো কিছুদূর এগোবার পর ডরোথি ভারী চমৎকার পোশাক পরা এক অল্পবয়েসী রাজকন্যাকে দেখতে পেলো। আগন্তুকদের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রাজকন্যা, পরমুহূর্তে দৌড়ে পালাতে শুরু করলো।

রাজকন্যাকে ভালো করে দেখার জন্যে ডরোথিও তার পিছু পিছু ছুটলো। তাই দেখে চীনেমাটির মেয়েটা আর্তনাদ করে উঠলো:

'আমাকে তাড়া ক'রো না! আমাকে তাড়া ক'রো না!'

তার ভয়ার্ত সরু গলা কানে পৌঁছুতেই ডরোথি থেমে দাঁড়ালো। 'কেন?' বললো সে।

'কারণ,' নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রাজকন্যা জবাব দিলো, 'দৌড়ুতে দৌড়ুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে ভেঙে যেতে পারি আমি।'

'কিন্তু ভাঙা শরীর তো মেরামত করিয়ে নিতে পারবে—তাই না?' ডরোথি জিজ্ঞেস করলো।

'তা পারবো, কিন্তু মেরামত করলে কী আর আগের মতো সুন্দর চেহারা থাকে, তুমিই বলো ?' রাজকন্যা জবাব দিলো।

'তা থাকে না বটে,' স্বীকার করলো ডরোথি।

'আমাদের এক সঙ আছে,' চীনেমাটির মেয়েটা বলতে লাগলো, 'মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সে সবসময়। পড়ে গিয়ে এতবার ভেঙেছে তার শরীর যে এ-পর্যন্ত তার অন্তত একশো জায়গায় মেরামত করাতে হয়েছে। একটুও সুন্দর লাগে না এখন তাকে দেখতে। ওই যে, এদিকেই আসছে সে—নিজেই তাকিয়ে দেখো, বুঝতে পারবে।'

সত্যিই হাসিখুশি চেহারার ছোট্ট এক সঙ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ডরোথি দেখতে পেলো, তার পরনে লাল, হলুদ আর সবুজ রঙের সুন্দর পোশাক থাকলেও অজস্র ফাটলের আঁকাবাঁকা রেখায় ভর্তি তার সারা শরীর। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেহের অনেক জায়গায় অনেকবার মেরামত করা হয়েছে।

কাছে এসে থেমে দাঁড়ালো সঙ। দু'হাত পকেটে ভরে গাল ফুলিয়ে খুব জাঁকের সঙ্গে ওদের অভিবাদন জানালো। তারপর বলে উঠলো :

'সুন্দরী গো মেয়ে,
অমন করে চেয়ে
দেখছো বুঝি সঙ বেচারার দশা ?
অবাক জড়োসড়ো
মুখে রা নেই বড়ো
আটকেছে কি গলায় মস্ত শসা ?'

'আহ্, চুপ করো!' তিরস্কার করলো রাজকন্যা, 'দেখছো না, এরা বিদেশী ? এদের সম্মান করা উচিত।'

'বেশ তো, দেখাচ্ছি 'সম্মান,' বলেই সঙ উল্টো হয়ে মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো।

'কিছু মনে ক'রো না সঙের ব্যবহারে,' রাজকন্যা বললো ডরোথিকে। 'ওর মাথাতেও অনেক ফাটল আছে কিনা, তাই অমন পাগলামি করে সবসময়।'

'না না, আমি কিছু মনে করিনি মোটেই,' বললো ডরোথি। 'তুমি কিন্তু সত্যি ভারী সুন্দর,' বলে চললো সে, 'খুব ভালোবাসতাম তোমাকে—যদি তোমাকে পেতাম। চলো না, আমার সঙ্গে ক্যানসাস যাবে—এম কাকীর চুল্লির তাকে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবো ? আমার ঝুড়িতে করে তোমাকে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারি।'

'খুব কষ্ট হবে তাহলে আমার,' চীনেমাটির রাজকন্যা জবাব দিলো। 'এখানে নিজের দেশে সুখে-শান্তিতে আছি আমরা; যেমন ইচ্ছে কথা বলতে পারি, ঘুরে বেড়াতে পারি। কিন্তু আমাদের কাউকে এ-দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের জোড়গুলো জমে যায়। সে-অবস্থায় আমরা শুধু সটান দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের শোভা বাড়াতে পারি। অবশ্য লোকে চায়, চুল্লির তাকে, আলমারিতে, বসার ঘরের টেবিলের ওপর অমনি করেই দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। কিন্তু এখানে নিজের দেশে আমাদের জীবন অনেক বেশি সুখের।'

'না না, তোমাকে আমি কিছুতেই কষ্ট দিতে চাই না!' ডরোথি বলে উঠলো। 'তাহলে, বিদায়!'

'বিদায়!' জবাব দিলো রাজকন্যা।

www.boiRboi.blogspot.com

চীনেমাটির দেশের ভেতর দিয়ে ওরা খুব সাবধানে এগোতে থাকলো। ছোট ছোট জীবজন্তু, সমস্ত লোকজন দ্রুত সরে যাচ্ছে ওদের পথ থেকে। সবার ভয়, বিদেশীরা তাদের ভেঙে ফেলবে। ঘন্টাখানেক চলার পর ওরা রাজ্যের অন্য প্রান্তে এসে হাজির হলো।

সামনে আরেকটা চীনেমাটির দেয়াল। আগের দেয়ালের মতো অতোটা উঁচু নয় অবশ্য। সিংহ স্থির হয়ে দাঁড়ালো দেয়ালের পাশে, অন্য সবাই তার পিঠের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল টপকে অন্য পাশে নেমে পড়লো। এরপর সিংহ পা গুটিয়ে তড়াক করে লাফ দিয়ে দেয়াল পার হয়ে গেল। কিন্তু লাফ দেয়ার মুহূর্তে তার লেজের ঘায়ে চুরমার হয়ে গেল একটা চীনেমাটির গির্জা।

'খুব খারাপ হলো কাজটা,' বললো ডরোথি। 'তবে সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়, একটা গরুর পা আর একটা গির্জা ভাঙা ছাড়া এই খুদে লোকদের আরো যে বেশি ক্ষতি হয়নি আমাদের দিয়ে, সেটাই সৌভাগ্যের কথা। যা ভঙ্গুর এরা!'

'ঠিক বলেছো,' কাকতাড়ুয়া সায় দিলো। 'সেদিক থেকে আমার ভাগ্য খুব ভালো বলতে হবে—খড়ে তৈরী আমার শরীর, সহজে ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। কাকতাড়ুয়া হয়ে জন্মানোর চেয়েও খারাপ জিনিস এই দুনিয়ায় আছে দেখছি।'

www.boiRboi.blogspot.com

একুশ

চীনেমাটির দেয়াল পেরিয়ে ডরোথি আর তার সঙ্গীরা দেখলো, ওরা এক দুর্গম অঞ্চলে এসে পড়েছে। চারদিকে শুধু ডোবা আর জলা, লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া ঘাসে ছাওয়া। কাদাভর্তি গর্তে পা না দিয়ে এগোনোই কঠিন, কারণ ঘন ঘাসের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে গর্তগুলো।

যাই হোক, সাবধানে পথ খুঁজে নিরাপদেই এগিয়ে চললো ওরা। একসময় শক্ত জমিতে এসে পৌঁছুলো। কিন্তু আরো বেশি বুনো মনে হচ্ছে এখন এলাকাটা। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে অতিকষ্টে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে ওরা আরেকটা বনে এসে ঢুকলো। যেমন বিশাল তেমনি প্রাচীন এ-বনের সমস্ত গাছপালা। এমন গহীন অরণ্য ওরা আগে কখনো দেখেনি।

'বাহ্, এ দেখছি দারুণ বন!' চারদিকে চেয়ে সোল্লাসে বলে উঠলো সিংহ। 'এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আমি জীবনেও দেখিনি।'

'কেমন ভয়ানক অন্ধকার মনে হচ্ছে,' বললো কাকতাড়ুয়া।

'মোটেই না,' সিংহ জবাব দিলো। 'আমি এখানে সারাজীবন মনের সুখে কাটিয়ে দিতে পারি। কী নরম দেখো পায়ের নিচের শুকনো পাতাগুলো! কী চমৎকার তাজা সবুজ শ্যাওলা জমে আছে

বুড়ো গাছগুলোর গায়ে। বসবাসের জন্যে এর চেয়ে মজার জায়গার কথা কোনো বুনো জানোয়ার কল্পনাও করতে পারবে না।'

'বুনো জানোয়ার হয়তো অনেক আছে এ-বনে,' বললো ডরোথি।

'থাকারই কথা,' সিংহ উত্তর দিলো, 'তবে আশেপাশে দেখছি না কাউকে।'

বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চললো ওরা। ধীরে ধীরে ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে এলো—আর এগোনো সম্ভব নয়। ডরোথি, টোটো আর সিংহ ঘুমোবার জন্যে শুয়ে পড়লো। কাঠুরে আর কাকতাড়ুয়া পাহারায় রইলো যথারীতি।

সকালবেলা আবার ওরা যাত্রা শুরু করলো। কিছুদূর যেতেই নিচু একটা গমগম আওয়াজ ভেসে এলো ওদের কানে, যেন একসঙ্গে অসংখ্য বুনো জানোয়ার গর্জন করছে। টোটো সামান্য কুঁইকুঁই করলো, তাছাড়া আর কেউ-ই ভয় পায়নি। বনের সরু পথ ধরে এগিয়ে চললো সবাই একসঙ্গে।

হঠাৎ বনের ভেতরের একটা খোলা জায়গায় এসে হাজির হলো ওরা। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো, সব ধরনের শত শত বুনো জানোয়ার সেখানে জড়ো হয়েছে। বাঘ, হাতি, ভালুক, নেকড়ে, শেয়াল এবং আরো যতো রকমের জন্তুর কথা ওদের জানা আছে সব রয়েছে সেখানে। ডরোথি প্রথমে বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সিংহ বললো, জানোয়ারেরা আসলে সবাই মিলে সভা করছে; আর তাদের তর্জন-গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ভয়ানক কোনো বিপদে পড়েছে তারা।

সিংহের গলা শুনতে পেয়ে কিছু জানোয়ার ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন জাদুমন্ত্রের বলে বিশাল সভায়

www.boiRboi.blogspot.com

নীরবতা নেমে এলো। সবচেয়ে বড়ো বাঘটা এগিয়ে এসে সিংহকে কুর্নিশ করে বললো:

'স্বাগতম, হে পশুরাজ। তুমি ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছো। আমাদের শত্রুকে বধ করে তুমি নিশ্চয় বনের পশুদের মধ্যে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

'কী হয়েছে তোমাদের?' সিংহ শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো।

'ভয়াল এক শত্রু আমাদের সবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে,' জবাব দিলো বাঘ। 'কিছুদিন হলো এই বনে এসেছে সেই ভয়ঙ্কর দানব। অতিকায় মাকড়সার মতো দেখতে সে; হাতীর মতো প্রকাণ্ড দেহ, একেকটা পা গাছের গুঁড়ির মতো লম্বা। আট পায়ে ভর দিয়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সে। যখন ইচ্ছে যে-কোনো জানোয়ারের পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আস্ত মুখে পুরে দেয়, মাকড়সা যেমন করে মাছি খায় তেমনি করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তাকে। এই হিংস্র দানব যতদিন বেঁচে আছে, আমাদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। কী করে নিজেদের বাঁচানো যায় তা-ই নিয়ে আলোচনার জন্যে এই সভা ডেকেছি আমরা। আর ঠিক এই সময় তুমিও এসে পড়েছো।'

সিংহ কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ভাবলো।

'বনে আর কোনো সিংহ আছে?' জানতে চাইলো সে।

'না—কয়েকটা ছিলো, দানবটা তাদের সবাইকে খেয়ে ফেলেছে। আর তাছাড়া ঠিক তোমার মতো এতো প্রকাণ্ড আর সাহসী তারা কেউ ছিলো না।'

'যদি আমি তোমাদের শত্রুকে শেষ করে দিই, তোমরা কী আমার বশ্যতা স্বীকার করে আমাকে বনের রাজা বলে মেনে নেবে?' বললো সিংহ।

'নিশ্চয়ই, সানন্দে মেনে নেবো,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো বাঘ। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বনের অন্যান্য সমস্ত পশুও প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠলো, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়!'

'তোমাদের সেই দানব মাকড়সা এখন কোথায়?' সিংহ জানতে চাইলো।

'ওই যে ওকগাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে,' সামনের থাবা বাড়িয়ে দূরের একটা জায়গা দেখালো বাঘ।

'আমার এই বন্ধুদের ভালোভাবে দেখে রেখো,' বললো সিংহ, 'এখুনি যাচ্ছি আমি দানবটার সঙ্গে লড়তে।'

সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বীরদর্পে এগিয়ে চললো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

ওকগাছের জঙ্গলের কাছে পৌঁছে সিংহ দেখলো, দানব মাকড়সা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন কুৎসিত দেখতে জানোয়ারটা যে ঘৃণায় তার নাক কুঁচকে উঠলো। বাঘ যেমন বলেছিল, ঠিক সেরকমই লম্বা দানবটার পাগুলো। সারা গা ঝাঁকড়া কালো লোমে ঢাকা। প্রকাণ্ড মুখের হাঁ, তার ভেতর সারবাঁধা ধারালো দাঁত। লম্বায় একেকটা দাঁত প্রায় একফুট হবে। কিন্তু দানবটার তাগড়া মজবুত দেহ আর প্রকাণ্ড মাথার মাঝখানের গলাটা আশ্চর্যরকম সরু, ঠিক যেন বোল-তার কোমর। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই সিংহ বুঝে নিলো কীভাবে আক্রমণ করলে সবচেয়ে সহজে পরাস্ত করা যাবে জানোয়ারটাকে। তাছাড়া সে জানে, জন্তুটা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে আক্রমণ করলেই তাকে কাবু করা সহজ হবে।

আর দেরি না করে সিংহ প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে সোজা দানবটার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পরমুহূর্তে ধারালো নখরওয়ালা

www.boiRboi.blogspot.com

ভারী থাবার এক ঘায়ে অতিকায় মাকড়সার মাথা আলাদা করে ফেললো ধড় থেকে। তারপর লাফিয়ে নিচে নেমে দূরে সরে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করলো ধড়টা, লম্বা পাগুলো যন্ত্রণায় মোচড় খেতে থাকলো। তারপর একসময় স্থির হয়ে গেল সব। সিংহ বুঝতে পারলো, শেষ হয়ে গেছে বনের ভয়াল দানব।

খোলা জায়গায় ফিরে গেল সিংহ। বনের পশুরা তার জন্যে দল বেঁধে অপেক্ষা করছিল। গর্বের সঙ্গে বলে উঠলো সে:

'আর ভয় নেই তোমাদের, দানব খতম হয়ে গেছে!'

সিংহকে রাজা মেনে বনের সমস্ত পশু মাথা নুইয়ে তাকে কুর্নিশ করলো। পশুদের কথা দিলো সে, ডরোথি নিরাপদে ক্যানসাসের পথে রওনা হয়ে গেলেই সে ফিরে এসে তাদের শাসনের ভার নেবে।

পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

বাইশ

বনের বাকি পথ চার পথিক নিরাপদেই পার হয়ে গেল। অন্ধকার বন থেকে বেরিয়ে ওরা দেখলো, সামনে একটা খাড়া পাহাড়। গোড়া থেকে চূড়ো পর্যন্ত পাহাড়ের সমস্ত গা অসংখ্য বড়ো বড়ো পাথরের চাঁইয়ে ভর্তি।

'ভারী কঠিন হবে গা বেয়ে ওঠা,' বললো কাকতাড়ুয়া, 'কিন্তু যেভাবেই হোক পাহাড় আমাদের ডিঙোতেই হবে।' সবার আগে এগিয়ে গেল সে।

অন্য সবাই কাকতাড়ুয়ার পিছু নিলো। প্রথম পাথরখণ্ডের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এমন সময় হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এলো:

'খবরদার, আর এগিয়ো না!'

'কে তুমি?' জানতে চাইলো কাকতাড়ুয়া।

পাথরের আড়াল থেকে একটা মাথা উঁকি দিলো। আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ, 'এ-পাহাড় আমাদের। আমরা কাউকে এ-পাহাড় পেরোতে দিই না।'

'কিন্তু আমাদের পেরোতেই হবে,' বললো কাকতাড়ুয়া। 'কোয়াড-লিংদের দেশে যাচ্ছি আমরা।'

www.boiRboi.blogspot.com

'না, পাহাড় কিছুতেই ডিঙোনো চলবে না।' বলতে বলতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ভারী অদ্ভুত চেহারার এক আজব মানুষ।

বেঁটেখাটো মজবুত দেহ লোকটার, কিন্তু মাথাটা প্রকাণ্ড। মাথার ওপরদিকটা চ্যাপটা, সমতল। গলাটা মোটা, ভাঁজে ভর্তি। কিন্তু হাত বলতে কিছু নেই লোকটার।

কাকতাড়ুয়ার মনে হলো, এমন অসহায় একটা প্রাণী ওদের পাহাড় পেরোতে বাধা দেবে এরকম ভাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কাজেই সে বললো:

'তোমার কথা মানতে পারছি না বলে দুঃখিত। তোমরা চাও আর না চাও, তোমাদের পাহাড় ডিঙিয়ে ওপাশে যেতেই হবে আমাদের।'

কাকতাড়ুয়ার কথা শেষ হতে না হতেই বিদ্যুতের বেগে সামনে ছুটে এলো লোকটার মাথা, গলাটা লম্বা হয়ে গেল সেইসঙ্গে, মাথার চ্যাপটা উপরিভাগ কাকতাড়ুয়ার বুকে প্রচণ্ড এক আঘাত হানলো। ছিটকে পড়লো কাকতাড়ুয়া, গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের গোড়ায় নেমে এলো।

যেমন দ্রুত ছুটে এসেছিল মাথাটা, তেমনি আবার চোখের পলকে ফিরে গিয়ে ধড়ের সঙ্গে সেঁটে গেল। কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠে আজব লোকটা বললো:

'যতো সহজ ভেবেছো ততো সহজ হবে না কাজটা!'

অমনি অন্য পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে একসঙ্গে অনেক লোকের খনখনে হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। ডরোথি দেখলো, পাহাড়ের গায়ে শত শত হাতবিহীন হাতুড়ি-মাথা মানুষ। প্রত্যেক

পাথরের আড়ালে একজন করে দাঁড়িয়ে আছে।

কাকতাড়ুয়ার দুর্দশা দেখে লোকগুলো অমন হেসে ওঠায় সিংহের ভয়ানক রাগ হলো। বজ্রের শব্দের মতো প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে সামনে লাফিয়ে পড়লো সে, তারপর পাহাড় বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করলো।

আবার একজনের মাথা চোখের পলকে ছুটে এসে আঘাত করলো সিংহকে। সিংহের প্রকাণ্ড দেহ গড়িয়ে নেমে এলো পাহাড় থেকে, যেন কামানের গোলা এসে ঘা দিয়েছে তাকে।

এর মধ্যে ডরোথি দৌড়ে গিয়ে কাকতাড়ুয়াকে তুলে দাঁড় করিয়েছে। সিংহও টলতে টলতে এসে হাজির হলো সেখানে। তার শরীরের এখানে-ওখানে ছড়ে গেছে—ব্যথা পেয়েছে বেশ।

'ওরকম মাথা ছুঁড়ে ঘা মারে যারা তাদের সঙ্গে লড়াই করে কোনো লাভ নেই,' বললো সিংহ। 'কেউ টিকতে পারবে না ওদের সামনে।'

'তাহলে কী করবো আমরা এখন?' ডরোথি বিমূঢ় স্বরে বললো।

'উড়ুক্কু বানরদের ডাকো,' পরামর্শ দিলো টিনের কাঠুরে, 'এখনও তাদের একবার তলব করার অধিকার আছে তোমার।'

'ঠিক বলেছো!' জবাব দিলো ডরোথি। মাথায় সোনার মুকুট প'রে নিয়ে জাদুমন্ত্র আওড়ালো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বানরদের পুরো বাহিনী এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

'কী হুকুম?' বানররাজ কুর্নিশ করে জানতে চাইলো।

'এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমাদের কোয়াডলিংদের দেশে নিয়ে যাও,' বললো ডরোথি।

'এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি,' বানরসর্দার বললো।

সঙ্গে সঙ্গে উড়ুক্কু বানরেরা টোটোসহ ওদের চারজনকে শূন্যে তুলে উড়িয়ে নিয়ে চললো। পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওরা উড়ে যাচ্ছে দেখে হাতুড়ি-মাথার দল আক্রোশে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো। বারবার শূন্যের ভেতর অনেক ওপর পর্যন্ত মাথা ছুঁড়তে লাগলো তারা, কিন্তু উড়ুক্কু বানরদের নাগাল পাওয়া তাদের সাধ্যে কুলোলো না। বানরবাহিনী ডরোথি আর তার সঙ্গীদের নিরাপদে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এসে কোয়াডলিংদের সুন্দর দেশে নামিয়ে দিলো।

'শেষবারের মতো তলব করেছো তুমি আমাদের,' বানর-দলপতি বললো ডরোথিকে। 'তোমাদের মঙ্গল হোক। বিদায়!'

'বিদায়!' জবাব দিলো ডরোথি, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।'

শূন্যে উঠে গেল বানরের দল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল।'

চারদিকে চেয়ে ওদের মনে হলো, সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরা কোয়াডলিংদের দেশ। মাঠের পর মাঠ জুড়ে পাকা ফসলের সমারোহ, তার মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তা এগিয়ে গেছে। সুন্দর সব নদী বয়ে চলেছে ঢেউ তুলে, সেগুলোর ওপর মজবুত সেতু। উইঙ্কিদের দেশে সবকিছু হলদে, আর মাঞ্চকিনদের দেশে সব নীল—তেমনি এখানকার বেড়া, ঘরবাড়ি, সেতু সব উজ্জ্বল লাল রঙে রঙ করা। বেঁটে-মোটা কোয়াডলিংরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, নিরীহ চেহারার। তাদের সবার পরনে লাল রঙের পোশাক। সবুজ ঘাস আর হলদে-হয়ে-ওঠা ফসলের পটভূমিতে সে-রঙ ভারী উজ্জ্বল দেখায়।

উড়ুক্কু বানরেরা ডরোথি আর তার বন্ধুদের একটা খামারবাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে গেছে। হেঁটে বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় টোকা

www.boiRboi.blogspot.com

দিলো ওরা। কৃষকের বউ দরজা খুলে দিলো। ডরোথি কিছু খাবার চাইলে মহিলা ওদের সবাইকে তিন রকম কেক আর চার রকম বিস্কুট দিয়ে যত্ন করে খেতে দিলো। টোটোকে দিলো একবাটি দুধ।

'গ্লিণ্ডার প্রাসাদ এখান থেকে কতদুর?' জানতে চাইলো ডরোথি।

'বেশি দুর নয়,' কৃষকের বউ জবাব দিলো। 'সোজা দক্ষিণের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।'

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার রওনা হলো ওরা। কখনো ফসলের খেতের পাশ দিয়ে, কখনো সেতু পেরিয়ে হেঁটে চললো। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলো, সামনে এক অপূর্বসুন্দর প্রাসাদ। প্রাসাদের ফটকের সামনে তিনজন সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পরনে সোনার কারুকাজ করা সুদৃশ্য লাল উর্দি।

ডরোথি এগিয়ে যেতেই তরুণীদের একজন বলে উঠলো:

'দক্ষিণরাজ্যে কেন এসেছো তোমরা?'

'এখানকার শাসনকর্ত্রী মায়াবিনী গ্লিণ্ডার সঙ্গে দেখা করতে,' উত্তর দিলো ডরোথি। 'তার কাছে নিয়ে যাবে আমাদের?'

'তোমাদের নাম বলো, আমি গিয়ে গ্লিণ্ডাকে জিজ্ঞেস করছি তিনি তোমাদের দর্শন দেবেন কিনা।'

নিজেদের পরিচয় দিলো ওরা। সৈনিক তরুণী প্রাসাদের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর সে ফিরে এসে জানালো, ডরোথি এবং তার সঙ্গীদের এখুনি ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

তেইশ

গ্লিণ্ডার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে ওদের প্রাসাদের অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিলো ডরোথি, সিংহ কেশর থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেললো, কাকতাড়ুয়া নিজের খড়পোরা শরীর থাপড়ে গড়ন ফিরিয়ে নিলো ভালোভাবে, আর কাঠুরে তার টিনের শরীর ঘষেমেজে জোড়গুলোতে তেল লাগিয়ে নিলো।

পরিপাটি হয়ে সবাই সৈনিক তরুণীর পিছু পিছু বিশাল এক কামরায় গিয়ে ঢুকলো। মুখ তুলে চেয়ে দেখলো, সামনেই পদ্মরাগমণির সিংহাসনে বসে রয়েছে মায়াবিনী গ্লিণ্ডা।

ওদের মনে হলো, সত্যি যেমন রূপবতী গ্লিণ্ডা, তেমনি সে অনন্তযৌবনা। ঢেউ খেলানো উজ্জ্বল লাল চুলের রাশি এঁকেবেঁকে নেমে এসে তার কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। পরনে ধপ্ধপে শাদা পোশাক। মায়াময় নীল চোখের নরম দৃষ্টি মেলে ডরোথির দিকে চাইলো সে। বললো:

'তোমার জন্যে কী করতে পারি আমি, বাছা?'

ডরোথি মায়াবিনীকে সমস্ত কাহিনী খুলে বললো: কী করে ঘূর্ণিবায়ু ওজের দেশে উড়িয়ে নিয়ে এলো তাকে, কোথায় কীভাবে সে

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গীদের খুঁজে পেলো, তারপর কতরকম আশ্চর্য অভিযানে বেরোতে হলো ওদের—সব জানালো একে একে।

'এখন আমার একমাত্র ইচ্ছে, ক্যানসাসে ফিরে যাওয়া,' সবশেষে যোগ করলো সে, 'কারণ এম কাকী নিশ্চয় খুব মুষড়ে পড়েছে আমার ভয়ানক কোনো বিপদ হয়েছে ভেবে। তার ওপর এবার যদি গত বছরের চেয়ে ভালো ফসল না হয় তাহলে হেনরি কাকাও খুব দুর্দশায় পড়বে।'

গ্লিণ্ডা ঝুঁকে পড়ে ছোট্ট ডরোথির সুন্দর মিষ্টি মুখে চুমু খেলো।

'ভারী সুন্দর তোমার অন্তর,' বললো মায়াবিনী। 'ক্যানসাস ফেরার একটা উপায় তোমায় আমি নিশ্চয় বলে দিতে পারবো। কিন্তু তার বিনিময়ে সোনার মুকুটটা দিতে হবে আমাকে।'

'নিশ্চয়ই দেবো!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো ডরোথি। 'ওটা তো আর আমার কোনো কাজেও আসছে না। তোমাকে দিলে বরং তুমি উড়ুক্কু বানরদের তিনবার ডেকে যে-কোনো হুকুম দিতে পারবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক ওই তিনটে কাজই বোধ হয় ওদের দিয়ে করাতে হবে আমাকে,' মুচকি হেসে বললো গ্লিণ্ডা।

ডরোথি সোনার মুকুটটা মায়াবিনীকে দিয়ে দিলো।

কাকতাড়ুয়ার দিকে চাইলো মায়াবিনী। 'ডরোথি চলে যাওয়ার পর কী করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'পান্নানগরীতে ফিরে যাবো,' কাকতাড়ুয়া জবাব দিলো। 'ওজ আমাকে ওখানকার শাসনকর্তা করে দিয়ে গেছে; তাছাড়া রাজ্যের লোকেরাও পছন্দ করে আমাকে। এখন আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা, পথে কী করে ওই হাতুড়ি-মাথাদের পাহাড় পেরোবো।'

'সোনার মুকুট থাকতে ভাবনা নেই,' বললো গ্লিণ্ডা। 'উড়ুক্কু

www.boiRboi.blogspot.com

বানরদের ডেকে আমি হুকুম দেবো যেন ওরা তোমাকে পান্নানগরীর ফটকে পৌঁছে দিয়ে আসে। এমন চমৎকার একজন শাসক পাবার সৌভাগ্য থেকে পান্নানগরীর লোকদের বঞ্চিত করা মোটেই উচিত হবে না।'

'সত্যি চমৎকার আমি?' কাকতাড়ুয়া জানতে চাইলো।

'তুমি অসাধারণ,' উত্তর দিলো গ্লিণ্ডা।

এবার টিনের কাঠুরের দিকে চাইলো মায়াবিনী। বললো:

'ডরোথি চলে যাবার পর তোমার কী হবে?'

কুড়ুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করলো কাঠুরে। তারপর বললো:

'উইঙ্কিদের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট ভালোবাসা পেয়েছি—দুষ্ট ডাইনী মারা যাওয়ার পর ওরা আমাকে ওদের দেশ শাসনের ভার নিতে অনুরোধ করেছিল। আমারও উইঙ্কিদের বেশ ভালো লেগেছে। যদি আবার পশ্চিমরাজ্যে ফিরে গিয়ে সারাজীবন সেখানকার শাসনকর্তা হয়ে থাকতে পারতাম, তাহলে তার বেশি আর কিছুই আমি চাইতাম না।'

'দ্বিতীয়বার উড়ুক্কু বানরদের আমি আদেশ দেবো, যেন তারা তোমাকে নিরাপদে উইঙ্কিদের দেশে পৌঁছে দেয়,' বললো গ্লিণ্ডা। 'কাকতাড়ুয়ার মতো তোমার মগজ অতো বড়ো না হলেও তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল তুমি—বিশেষ করে যদি শরীর ঠিকমতো ঘষেমেজে নাও। নিশ্চয় তুমি খুব ভালোভাবে সুবিবেচনার সঙ্গে উইঙ্কিদের শাসন করতে পারবে।'

এরপর মায়াবিনী ফিরে তাকালো ঝাঁকড়া লোমওয়ালা প্রকাণ্ড-দেহী সিংহের দিকে। তাকে প্রশ্ন করলো:

'ডরোথি নিজের দেশে ফিরে গেলে তোমার কী হবে?'

'হাতুড়ি-মাথাদের পাহাড়ের ওপারে অদ্ভুত সুন্দর এক প্রাচীন গহীন বন আছে,' জবাব দিলো সিংহ, 'সেখানকার সব পশু আমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। সেই বনে যদি আমি ফিরে যেতে পারতাম শুধু, সত্যি বড়ো সুখে জীবন কাটাতে পারতাম।'

'বেশ, আমি উড়ুক্কু বানরদের তৃতীয়বার আদেশ করবো, তারা যেন তোমাকে সেই বনে পৌঁছে দেয়,' গ্লিণ্ডা বললো। 'সোনার মুকুটের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে এরপর। তখন আমি সেটা বানরদের রাজাকে দিয়ে দেবো। তাহলে সে আর তার দলবল চিরদিনের জন্যে মুক্তি পেয়ে যাবে।'

কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরে আর সিংহ তখন মায়াবিনীকে তার দয়ার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালো। ডরোথি বলে উঠলো:

'সত্যি যেমন সুন্দর তুমি, তেমনি উদার তোমার মন। তবে আমি কী করে ক্যানসাস ফিরে যাবো তা কিন্তু এখনো বলোনি।'

'তোমার রুপোর জুতো তোমাকে মরুভূমি পার করে নিয়ে যাবে,' জবাব দিলো গ্লিণ্ডা। 'ও-জুতোর ক্ষমতার কথা যদি তোমার জানা থাকতো তাহলে যেদিন তুমি এ-দেশে এসেছো সেদিনই তোমার এম কাকীর কাছে ফিরে যেতে পারতে।'

'কিন্তু তাহলে তো এই দারুণ মগজ আমার পাওয়া হতো না!' বলে উঠলো কাকতাড়ুয়া। 'হয়তো ফসলের খেতে খুঁটির মাথায়ই কাটিয়ে দিতে হতো আমাকে সারাটা জীবন।'

'আমিও তাহলে এই চমৎকার হৃৎপিণ্ড কোনদিন পেতাম না,' টিনের কাঠুরে বললো। 'হয়তো পৃথিবীর লয় না হওয়া পর্যন্ত অমনি করেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম বনের ভেতর—সমস্ত শরীর ছেয়ে

যেতো মরচেয়।'

'আর আমি তাহলে চিরকাল কাপুরুষই থেকে যেতাম,' বললো সিংহ, 'বনের কোনো পশু কোনদিন আমার দিকে ফিরেও তাকাতো না।'

'এ-সবই সত্যি,' বললো ডরোথি, 'চমৎকার এই বন্ধুদের উপকারে আসতে পেরেছি বলে ভারী ভালো লাগছে আমার। তবে সবার মনের আশা যখন পূরণ হয়েছে, এমনকি প্রত্যেকে একটা করে রাজ্যও পেয়েছে শাসন করার জন্যে, তখন ক্যানসাসে ফিরে যেতে পারলেই এখন আমি খুশি হবো।'

'রুপোর জুতোজোড়ার আশ্চর্য সব ক্ষমতা রয়েছে,' বললো মায়াবিনী গ্লিণ্ডা। 'তার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত একটা জিনিস হলো, জুতোজোড়া যে-কাউকে আশ্চর্য দ্রুত পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। মাত্র তিনবার পা পড়বে মাটিতে, একেকবার পা পড়তে সময় লাগবে মাত্র এক পলক। এজন্যে খুব বেশি কিছু করতে হবে না তোমাকে, শুধু দু'পায়ের জুতোর গোড়ালি তিনবার একসঙ্গে ঠুকে যেখানে যেতে চাও সেখানে নিয়ে যেতে হুকুম করবে।'

'যদি তা-ই হয়,' উৎফুল্ল ডরোথি বলে উঠলো, 'তাহলে জুতোজোড়াকে আমি এক্ষুণি বলবো আমাকে ক্যানসাসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।'

সিংহের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলো ডরোথি, তার মস্ত মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো। তারপর টিনের কাঠুরেকে চুমু খেলো সে—শরীরের জোড়গুলো বিকল হয়ে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কাঠুরে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছে। কাকতাড়ুয়ার রঙে-আঁকা মুখে চুমু না খেয়ে ডরোথি তার নরম খড়পোরা

www.boiRboi.blogspot.com

শরীর জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো। প্রিয় সাথীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির এই করুণ মুহূর্তে নিজেও ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।

মায়াবিনী গ্লিণ্ডা তার পদ্মরাগমণির সিংহাসন থেকে নেমে এসে ছোট্ট ডরোথিকে চুমু খেয়ে বিদায় জানালো। ডরোথিও তার এবং তার বন্ধুদের প্রতি গ্লিণ্ডা যে-অনুগ্রহ দেখিয়েছে সেজন্যে মায়াবিনীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালো।

এবার গাম্ভীর্যের সঙ্গে টোটোকে কোলে তুলে নিলো ডরোথি। শেষবারের মতো সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'পায়ের জুতোর গোড়ালি তিনবার একসঙ্গে ঠুকে বলে উঠলো:

'ক্যানসাসে এম কাকীর কাছে নিয়ে চলো আমাকে!'

পরমুহূর্তে অনুভব করলো ডরোথি, শূন্যের ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে সে। এমন অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ছুটছে রুপোর জুতো যে চোখে দেখতে পেলো না ও কিছুই, শুধু বাতাসের তীক্ষ্ণ শোঁ-শোঁ আওয়াজ শুনতে পেলো কানের পাশে।

মাত্র তিনবার মাটিতে পা পড়লো ডরোথির, তারপর এমন আচমকা থেমে গেল সে যে কোথায় এসেছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে বেশ কয়েকপাক গড়িয়ে গেল ঘাসের ওপর দিয়ে।

অবশেষে একটু দম ফিরে পেয়ে উঠে বসলো ও। চারদিকে তাকালো।

'ও মা, এ কি!' চিৎকার করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

ক্যানসাসের দিগন্তজোড়া তৃণভূমির মাঝখানে বসে রয়েছে ডরোথি। ঠিক সামনেই নতুন খামারবাড়ি—ঘূর্ণিবায়ু পুরোনো বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পর হেনরি কাকা তৈরি করেছে। ওই তো, গোলাঘরের আঙিনায় গরুর দুধ দুইছে হেনরি কাকা!

এরই মধ্যে টোটো ওর কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহানন্দে ঘেউঘেউ করতে করতে গোলাঘরের দিকে ছুট দিয়েছে।

উঠে দাঁড়ালো ডরোথি। এ-সময়ই ওর নজরে পড়লো, শুধু মোজা রয়েছে ওর পায়ে। শূন্যের ভেতর দিয়ে ধেয়ে আসার সময় রুপোর জুতোজোড়া কখন যেন পা থেকে খুলে পড়ে গেছে—চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে মরুর রাজ্যে।

www.boiRboi.blogspot.com

চব্বিশ

এম কাকী বাড়ি থেকে মাত্র বাইরে বেরিয়েছে বাঁধাকপির খেতে জল দিতে। মুখ তুলে সামনে তাকিয়েই দেখতে পেলো, তার দিকে ছুটে আসছে ডরোথি।

'সোনামণি আমার!' ছোট্ট ডরোথিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়ে দিতে দিতে বলে উঠলো কাকী। 'কোত্থেকে এলি তুই এতদিন পরে?'

'ওজের দেশ থেকে,' ডরোথি গম্ভীর মুখে বললো। 'টোটোও এসেছে—ওই দেখো। আবার বাড়ি ফিরে আসতে পেরে কী যে ভালো লাগছে আমার, এম কাকী!'

www.boiRboi.blogspot.com

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডারযোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার সিরিজের

ভীষণ অরণ্য-১

রচনা: রকিব হাসান

মূল্য: ১৬০ পৃষ্ঠা/১৬'০০ টাকা মাত্র

বিষয়: আমাজনের তীরের ভীষণ অরণ্যে চলেছে এবার তিন গোয়েন্দা। জংলীদের তীর খেয়ে জ্ঞান হারালেন মুসার বাবা। অমন ভয়ানক জঙ্গলে বৈরি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এখন শুধু তিনটি কিশোর।